দ্বিতীয় অধ্যায়
মনসামঙ্গল কাব্যে মনসার পরিচয়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মনসা-কথার নবনির্মাণ আলোচনা করতে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত মনসা-মঙ্গলকাব্যগুলিতে মনসাদেবীর পরিচয় কিভাবে পাই সেগুলির অনুসন্ধান প্রয়োজন। যা এই অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে আমি রেখেছি।

খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে কিছু ধর্মমূলক আখ্যানকাব্যের সন্ধান মেলে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই সব ধর্মমূলক আখ্যানকাব্যকে 'মঙ্গলকাব্য' অভিধায় চিহ্নিত করা হয়। 'মঙ্গল' অর্থাৎ কল্যাণ এবং কল্যাণের সঙ্গে মাহাত্ম্যসূচক একটা সম্পর্ক যোজনা করে দেবদেবীদের মহিমা-কীর্তনের অভিপ্রায়ে রচিত হয়েছে বাংলা মঙ্গলকাব্য। আসলে দেবদেবীর মহিমা প্রকাশ করা হয়েছে প্রধানত তাঁদের স্বেচ্ছাচারজনিত ভয়-ভীতির কারণে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে কিছু পাওয়ার অভিলাষে। এসব অভিপ্রায়ে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ বিশেষ কোনো অধিষ্ঠাত্রী দেবী কিংবা দেবতার গুণকীর্তন করে এই ধারার কাব্যের সূচনা করেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা এবং খ্যাতি সম্পন্ন সমালোচকঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—

> ''বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত পৌরাণিক, লৌকিক এবং পৌরাণিক-লৌকিক সংমিশ্রিত দেব-দেবীর লীলামাহাত্ম, পূজা-প্রচার ও ভক্ত কাহিনী অবলম্বনে যে ধরনের সম্প্রদায়গত, প্রচারধর্মী ও আখ্যানমূলক কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য বলা হয়।''[১]

তবে মঙ্গল কাব্যে সাধারণত হিন্দু-পুরাণ নির্ভর কোনো কাহিনীর আশ্রয়ে, বিশেষত, মানবভাগ্যের কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। এই কাহিনীর নায়ক একজন স্বর্গচ্যুত ব্যক্তি। তিনি অশেষ মানবিক গুণের অধিকারী। এইদিক থেকে একথা মনে করার কারণ আছে যে, মঙ্গলকাব্যে দেবতাদের আধিপত্য তাতে পরোক্ষত স্বৈরতন্ত্রের প্রভাব সঞ্চার করে, কিন্তু এই হীন কূটকৌশলগত দৈবপ্রয়োগ দেবতার অধিকার বাড়ায় না, বরং মানুষেরই জয়গান হয়। সার্বজনীন মানুষের বিকাশ সাধনের জন্যেই, একথা বলা যায়, মঙ্গলকাব্যে কাব্যমূল্যও অটুট। বাংলাদেশ (অবিভক্ত বাংলা) রাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংকট-সমস্যাজনিত পর্যায়ের মুখোমুখি হয়। এরূপ অবস্থায় বাংলার সামাজিক জীবনে লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মের যে সমন্বয় ঘটেছে তার ইতিহাস লক্ষ্য করি বাংলা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে।

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে আমরা দেখতে পাই স্বর্গ থেকে অভিশপ্ত হয়ে বৈদিক দেবদেবী মর্ত্যে মানবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন লৌকিক দেবদেবীর পূজা প্রচার হেতু। এখানে আর্য ও প্রাগার্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে। সমন্বয় সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায় উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অস্তিত্ব সংকটের সময়। অনুবাদ সাহিত্যেও একইভাবে বৈদিক দেবদেবীর মহিমা প্রচারের জন্য বাংলায় অনুদিত হয় সংস্কৃত মহাকাব্য।

নতুন ধর্মভাবনা, নতুন শাসনব্যবস্থা আসতে শুরু করল ঠিকই, মানুষ গ্রহণ করল ঠিকই, কিন্তু পুরাতন একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেনি। পুরাতনকে রূপান্তর করে নূতনত্বের সৃষ্টি হয়। মধ্যযুগের বাংলার সমাজ এই নূতনকে পুরাতনের মধ্যে সুন্দর-সামঞ্জস্য বিধান করে পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটি সংস্কারকে একসূত্রে গেঁথে দিবার চেষ্টা করেছে। বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যে কিভাবে একদেহে লীন হয়ে আছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তারই পরিচয়।

মঙ্গল কাব্যগুলির আখ্যান-বিন্যাসে পুচ্ছানুগ্রাহিতা ও গঠন-শৈলীতে নির্দিষ্ট কিছু বিশেষ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। কোনো দেবদেবীকে অবলম্বন করে বহু কবি একই আখ্যান রচনা করে গেছেন। নতুনত্ব আনার কোনো সুযোগ নেই তথাপি যুগবৈশিষ্ট্য ও সামাজিক-আর্থিক-ধর্মীয় চিত্রগুলি পেতে মঙ্গল কাব্যের বিশেষ সহায়তা করে। এক্ষেত্রে প্রধান প্রধান কাব্যগুলি হল—

১. মনসামঙ্গল

২. চণ্ডীমঙ্গল

৩. ধর্মমঙ্গল

৪. শিবমঙ্গল

৫. অন্নদামঙ্গল

এছাড়া অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে কালিকামঙ্গল, রায়মঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যগুলি আমরা পাই যা মঙ্গলকাব্যধারাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রেখেছে।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসা দেবীর মাহাত্ম্যসূচক মনসামঙ্গল সর্বাপেক্ষা প্রচার লাভ করেছিল। বাংলাতে তো বটেই, বাংলার বাইরেও প্রচার লাভ করেছে। পূর্ববঙ্গের কবি নারায়ণ

দেবের মনসামঙ্গল সমগ্র আসাম প্রদেশে প্রচার লাভ করেছিল। এমনকি, এখনও আসামের লোকেরা নারায়ণদেবকে নিজ রাজ্যের কবি মনে করে। উত্তর বিহারেও 'মনসামঙ্গল' কাব্যের মধ্যেকার বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী বহুল প্রচলিত।

মনসামঙ্গলের কাহিনীতে আমরা দুইটি ভাগ পেয়ে থাকি। একটি দেবখণ্ড অন্যটি মর্ত্যখণ্ড। স্থান-কাল-পাত্রভেদে পার্থক্য থাকলেও বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনায় সংক্ষেপণ, বিস্তৃতি-গ্রহণ-বর্জন-সংযোজন থাকলেও মনসামঙ্গলের একটি গতানুগতিক কাহিনী আমরা সব কবির কাব্যেই পেয়ে থাকি। আমাদের সকলের জানা থাকলেও পূর্ণাঙ্গ মনসামঙ্গলের কাহিনীটির একটি কাঠামো বা বিষয়সূচী এখানে তুলে ধরলাম—

কামুক শিবের বীর্য পদ্মপাত্রে স্খলিত হলে তা থেকে মনসার জন্ম ও যুবতীরূপ ধারণ, অচেনা মনসার কাছে শিবের রতি কামনা, পিতা-কন্যার পরিচয়, চণ্ডীর ভয়ে সসঙ্কোচে কন্যা মনসাকে গৃহে আনয়ন, মনসাকে দেখে চণ্ডীর রোষ ও পদ্মাকে প্রহার, চণ্ডীর হাতে পদ্মার চক্ষু নষ্ট। রুষ্ট পদ্মার বিষদৃষ্টিতে চণ্ডীর অচৈতন্য হয়ে পড়া, শিবের অনুরোধে মনসা কর্তৃক চণ্ডীকে চেতনা দান, জরৎকারুর সঙ্গে মনসার বিবাহ, ভাগ্যের পরিহাসে স্বামী বিচ্ছেদ, সমুদ্র মন্থনে সৃষ্ট বিষপানে মহাদেবের চৈতন্য হারিয়ে ফেলা, মনসা কর্তৃক চৈতন্যদান, সৎমা চণ্ডীর ষড়যন্ত্রে দেবীর নির্বাসন ও পুরী নির্মাণ, কন্যা বিচ্ছেদের কাতর শিবের অশ্রু থেকে নেতার জন্ম, নেতাকে পদ্মার দেখাশোনার দায়িত্ব প্রদান ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে দেবখণ্ডের সমাপ্তি।

এরপরে মনসার মর্ত্যে পূজা প্রচারের সংকল্প দিয়ে মর্ত্যখণ্ড বা চাঁদ-সদাগর-বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী শুরু। প্রথমে রাখালদের, পরে হোসেন-হাসানের মাধ্যমে পূজা প্রচার, চাঁদের কাছ থেকে পূজা পাওয়ার ইচ্ছা, ধন্বন্তরী (শঙ্কুর গারুড়ী) বধ, চাঁদের ছয় পুত্রের প্রাণনাশ, চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা ও পণ্য বিনিময়, চৌদ্দ ডিঙ্গা নিমজ্জন, লখীন্দরের জন্ম, চাঁদের গৃহে প্রত্যাবর্তন, লখীন্দরের বিয়ের উদ্যোগ, লোহার বাসর নির্মাণ, বিয়ে, বাসরে সর্প-দংশনে লখীন্দরের মৃত্যু। ভেলায় মৃত স্বামী নিয়ে বেহুলার যাত্রা, ঘাটে ঘাটে নানা সংকট, অবশেষে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছান, নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে দেবতাকুলকে তুষ্ট করে শিবের সুপারিশে পদ্মার মাধ্যমে স্বামীসহ ছয় ভাশুরের জীবন ফিরিয়ে আনে, সেই সঙ্গে চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকরও। চাঁদকে দিয়ে মনসার পূজা করাবে এই সত্য করে বেহুলা-লখীন্দর দেশে ফিরে। ডোমের ছদ্মবেশে বেহুলা-লখীন্দরের বাড়িতে প্রবেশ, চাঁদকে বুঝিয়ে মনসার পূজায় রাজি করানো এবং মনসার মন্দির নির্মাণ ও মনসার পূজা প্রচারিত হলে বেহুলা-লখীন্দর রূপে ঊষা-অনিরুদ্ধ স্বর্গে গমন ইত্যাদির মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে মনসামঙ্গল কাহিনীর।

আঞ্চলিক ভিত্তিতে মনসামঙ্গল কাব্যগুলিকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি—

১. পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ়বঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের কবিরা হলেন— ক. বিপ্রদাস পিপলাই, খ. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, গ. বিষ্ণুপাল।

২. পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের কবিরা হলেন— ক. কানাহরি দত্ত, খ. বিজয়গুপ্ত, গ. নারায়ণ দেব, ঘ. দ্বিজ বংশীদাস, ঙ. ষষ্ঠীবর দত্ত।

৩. উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের কবিরা হলেন— ক. তন্ত্রবিভূতি, খ. জগজ্জীবন ঘোষাল, গ. জীবন মৈত্র।

আমি বর্তমান অধ্যায়ে মনসামঙ্গলের কয়েকজন কবি ও তাদের কাব্যে মনসার পূজা পাওয়ার প্রচেষ্টা, চাঁদ সদাগরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব প্রভৃতি ঘটনাধারার সঙ্গে মনসামঙ্গলের কাহিনী তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

কানা হরিদত্তকে পঞ্চদশ শতকের কবি বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গলের আদি কবি তথা তাঁর পূর্ববর্তী কবি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর **'পদ্মাপুরাণ'**-এর স্বপ্নাধ্যায় পালায় উল্লেখ করেছেন—

> ''সর্ব্ব লোকে গীত গাহে না বোজে মাহাত্ম্য।
> প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।।''[২]

মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত দিঘপাইৎ গ্রাম থেকে পাওয়া একখানি প্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্যে হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত কবিতা পাওয়া গেছে বলে তাকে পূর্ববঙ্গের কবি বলে উল্লেখ করা হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার হরিদত্তের যে পুঁথি আবিষ্কার করেছেন, তাতে মনসাদেবীর সর্পদ্বারা সজ্জিত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। শঙ্খিনী সর্প দিয়ে দুই হাতের শঙ্খ, কালনাগিনীকে কেশের সজ্জা, সুতলিয়া নাগ দিয়ে গলার সূতলি, সিন্দুরিয়া সাপ দিয়ে সিঁথির সিন্দুর, কাজুলিয়া নাগ দিয়ে চোখের কাজল প্রভৃতি সজ্জায় সজ্জিত হয়েছে দেবী মনসা। ড. দীনেশচন্দ্র সেন হরিদত্তকে একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি বলে উল্লেখ করেছেন— অর্থাৎ মুসলমান দ্বারা বঙ্গদেশ অধিকারের আগে হিন্দু রাজত্বের শেষ সময়ে যখন গৌড়দেশের উৎসব, সাহিত্য এবং আমোদ-প্রমোদ সমস্ত আর্যদেশে ছড়িয়ে পড়ছিল, সেই সময়ে হরিদত্ত তাঁর কাব্য রচনা করেন। শ্রদ্ধেয় ড. দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্যটি নিম্নে তুলে ধরা হল—

> ''সম্ভবত: একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হরিদত্ত বিদ্যমান ছিলেন। হিন্দু রাজত্বের শেষ সময়ে যখন গৌড়দেশের উৎসব,

সাহিত্য এবং আমোদ-প্রমোদ সমস্ত আর্যাবর্ত্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেই
সময়ে সম্ভবত: হরিদত্ত তাঁহার কাব্য লিখিয়াছিলেন।"[৩]

উক্ত তথ্যের নিরিখে আমরা বলতে পারি যে কানা হরিদত্ত প্রাক্ চৈতন্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যজগতে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন এবং পরবর্তী কবিরা তাঁর কাব্যের দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছিলেন। তাঁর কাব্যে দেবী মনসার খুব বেশি পরিচয় না পেলেও দেবীর সাজসজ্জার পরিচয় পাই। মনসামঙ্গল কাব্যধারার আদি কবি হিসেবে কানা হরিদত্তের কাব্যের মনসার পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

মনসামঙ্গল কাব্যধারায় রাঢ় বঙ্গের কবি **বিপ্রদাস পিপলাই**। মনসামঙ্গলের এই প্রাচীন কবির কাব্য **'মনসাবিজয়'** নামে পরিচিত এছাড়া 'মনসামঙ্গল', 'মনসাচরিত', 'পদ্মামঙ্গল' নামের উল্লেখ রয়েছে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে। কাব্যের অন্তর্গত প্রথম পালার ৪নং কবিতায় যে আত্মবিবরণী দিয়েছেন, সেখান থেকে জানা যায় কবির পিতা মুকুন্দ পণ্ডিত, নিবাস হল চব্বিশ পরগণা জেলার নাদুড্যা বটগ্রাম (নাদুড্যা পাঠান্তরে মেলে বাদুড্যা)। বৈশাখ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে দেবী মনসা কবির শিয়রে বসে কাব্য রচনার আদেশ দেন। দেবীর আদেশ পেয়ে গুরুজন ও পণ্ডিতজনদের স্মরণ করে কাব্য রচনা শুরু করেন কবি কাব্যের কালজ্ঞাপক উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, সেটি হল—

''সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের প্রধান।"[৪]

প্রথম চরণটি থেকে আমরা পাই— ৭১৪১ = ১৪১৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪১৭ + ৭৮ = ১৪৯৫ খ্রী:। তখন হুসেন শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন। ভাষাবিদ্ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার শ্রদ্ধেয় ড. সুকুমার সেন বিপ্রদাস পিপলাই-এর রচিত কাব্য সম্পর্কে বলেছেন—

''মনসার কাহিনী সম্পূর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে বিপ্রদাসের কাব্যেই
মিলে। অন্য মনসামঙ্গল কাব্যে হয় কোন কোন আখ্যান মোটেই নাই,
নয় কোন কোন আখ্যান অপেক্ষাকৃত অল্পতর অথবা বৃহত্তর আয়তন
লইয়াছে। বিপ্রদাস ছাড়া সব কবি— যাঁহাদের রচনা পুরা মিলিয়াছে—
বেহুলা লখিন্দরের আখ্যানেই পূর্ণ মনোযোগ দিয়াছেন।"[৫]

সমালোচকের এই বক্তব্য মনসার সম্পূর্ণ কাহিনী একমাত্র বিপ্রদাসের কাব্যেই পাওয়া যায়। এখানে আমরা মোট ১৩টি পালা পেয়ে থাকি। কাব্যে দেব-দেবীর চরিত্র; মনসা, শিব, চণ্ডী ও নেতা এবং

মানব চরিত্র —চাঁদো, সনকা, বেহুলা, লখিন্দর, সঙ্ক ধন্বন্তরি, হাসন-হুসেন, জালু-মালু, ধনা-মনা প্রভৃতি চরিত্রগুলি নিয়ে কাহিনী ধারা এগিয়েছে।

বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়ে'র প্রথম পালায় আমরা গণেশ, নিরঞ্জন, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জরৎকারু নেতো এবং দ্বিজ গুরু-জনক বন্দনা করে মনসার জন্ম কথা বলেন। মনসাদেবীর নাগরূপ বর্ণনা করে অর্থাৎ মনসার সর্পসজ্জার কথা বলে দেবীর বিভিন্ন নামের পরিচয় দেন। কবির ভাষায় উঠে এসেছে—

''উদ্ভবা-পাতাল নাম পাতালকুমারী
নাগ-দান পাইয়া নাম হৈল নাগেশ্বরী।
কালিদহে পদ্মবনে হইল উতপতি
তথির কারণে নাম হৈল পদ্মাবতী।
মনেতে জনম জানি দেব ত্রিপুরারী
তথির কারণে নাম মনসাকুমারী।''[৬]

মোট তেইশটি কবিতা নিয়ে রচিত এই প্রথম পালায় কবি নিজের আত্মপরিচয় দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা করে শিব-গঙ্গার কথা, দেবতা-অসুরের কথা বর্ণনা করেছেন। গঙ্গার সঙ্গে ধর্মের সাক্ষাতে গঙ্গা ধবলমুখী হলে দেবতাগণ কর্তৃক গঙ্গার বন্দনা, গঙ্গার শিবের মাথায় স্থান প্রভৃতি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে অতি দক্ষতায় মনসার জন্ম বিবরণ দেন। কালীদহে শিব মদন পীড়িত হন। পরিণামে তাঁর বিন্দুপাত হয়। পদ্মপাতায় সে বিন্দু পড়ে, সেখানে থেকে জলে পড়লে পরে বাসুকির মা নির্মাণীর মাথায় পড়ে। নির্মাণী তা দিয়ে পুতুল পানিয়ে তার মধ্যে প্রাণ দান করেন, নাম দিলেন পদ্মা। পদ্মাকে বাসুকি বিষভাণ্ডারের অধিকারিণী করে দিলেন। এই পদ্মা কর্তৃক কালিদহ বিধ্বস্ত হলে শিব গরুড়কে নিয়ে আসেন সাপ ধ্বংস করার জন্য। শিবের সঙ্গে মনসার দেখা হলে তাকে কামচিত্তে দেখলে দেবী নিজের পরিচয় দিয়ে পিতার সঙ্গে নিজের বাড়ি যেতে চান। কিন্তু দেবী চণ্ডীর ভয়ে মহাদেব কন্যাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে না চাইলেও মায়াবশত শেষে ফুলের সাজিতে করে ঘরে নিয়ে আসেন। দেবী চণ্ডীর সঙ্গে মনসাদেবীর কলহ বাঁধে। কবি বিপ্রদাস পিপলাই অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই চিত্রটি তুলে ধরেছেন—

''মহাকোপে চণ্ডিকা লইল কৃশাবাণ।
তার ঘায়ে মনসার চক্ষু হৈল কান।''[৭]

পরে মহাদেব কন্যাকে সিজুয়া পর্বতে রেখে আসেন। সেখানে তাঁর 'নেত্রের জল' থেকে নেতো ও

'ললাটের ঘর্ম' থেকে ধামাই-এর সৃষ্টি হয়। দেবসমাজে ব্রাত্য মনসার করুণ অবস্থা কবি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় পালায় সমুদ্র মন্থনের কথা বর্ণনা করে তৃতীয় পালায় কবি দেবী মনসার বিবাহ প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। মুনি জরৎকারুর সঙ্গে মনসাদেবীর বিয়ের পর সৎমা চণ্ডীর কুপরামর্শে নাগ আভরণে সজ্জিত হয়ে স্বামী সম্ভাষণে গেলে ভয় পেয়ে মুনি সমুদ্রে গিয়ে লুকোলেন। পরে অবশ্য মনসাকে পুত্র বর দেন। নেতোর বিয়ে দেন শিব বশিষ্ঠের সঙ্গে। বশিষ্ঠও নেতোকে পুত্রবর দিয়ে অন্যত্র চলে যান। চতুর্থ পালায় ৯ নং কবিতায় সর্পসত্রযজ্ঞের মাধ্যমে পুরাণ কথার (দেবখণ্ডের) সমাপ্তি ঘটান কবি বিপ্রদাস। এখানে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, জনমেনজয়ের 'সর্পসত্রযজ্ঞ' ও আস্তিক কর্তৃক সর্পসত্র নিবারণ। পরে উদ্দেশ্য সফল হলে সিজুয়া পর্বতে ফিরে যান।

এরপরে মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম কাহিনী নরখণ্ডের সূত্রপাত হয়। এই চাঁদ সদাগরের ধন-ঐশ্বর্যের কথার বর্ণনা আমরা প্রথমেই পাই—

> ''চম্পকনগরে ঘর চাঁদো অধিকারী
> গন্ধবণিকের কুলে জনম তাহারি।
> রাজচক্রবর্তী রাজা রাজ্য বহুদূর
> কুলে শীলে ধনে জনে বলে মহীশূর।
> কুবের সমান ধন রত্নমণিময়।
> অসংখ্য অমূল্য নিধি দীপ্ত অতিশয়।।''[৮]

শিব-দুর্গার বরপ্রাপ্ত চাঁদ সদাগর কঠিন তপস্যার ফলে শিবের কাছ থেকে মহাজ্ঞান স্বরূপ 'সিদ্ধির ঝুলি' ও 'শিরে জয়-নেত' পান। বিপ্রদাসের কাব্যে আমরা দেখি দেবী চণ্ডী মনসা-শিবের দ্বন্দ্বে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মনসা 'দুষ্টমতি', দুরাচারী, দেবসভায় সর্বদা অপমানিত বলে চাঁদকে তাঁর পূজা না করার উপদেশ দেন। শিব ভক্ত চাঁদ সেই থেকে মনসা পূজা করে না। অন্যদিকে সিমুলা পর্বতে বসে নেতোর সঙ্গে যুক্তি করে মর্ত্যভূমিতে পূজা প্রচারের পরিকল্পনা করেন। নেতো খড়ি পেতে দেখে মহাজ্ঞানের অধিকারী চম্পকনগরের অধিপতি চাঁদ বণিকের পুজো আদায়ের কথা বলেন। দেবী পৃথিবী ভ্রমণে বেরোলে 'ডাইনীবুড়ি' সেজে রাখালদের সম্মুখে গিয়ে একাদশী ব্রতের জন্য কিছু দুধ চান। রাখালরা দেবীকে চিনতে না পেরে তাড়িয়ে দেয়। পরে দেবী নিজ রূপে আবির্ভূত হয়ে রাখালদের গর্তে পড়ে যাওয়া গরু উদ্ধার করে দেন। পরিবর্তে রাখালরা দেবীকে চুপড়ি ভর্তি দুধ দেয়। প্রসন্ন হয়ে দেবী ধন-সম্পত্তির আশ্বাস দিয়ে একটি গ্রাম বানিয়ে দেন রাখালদের। গ্রামের নাম দেন 'রাখালগাছি'। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমীতে জলভর্তি ঘটে ফল দিয়ে 'দশহারা ব্রত'

করতে বলেন। এইভাবে রাখালদের মধ্যে মনসার পূজা প্রচারিত হয়। এরপরেই হাসান-হুসেনের সঙ্গে মনসা দেবীর দ্বন্দ্ব বাঁধে। হোসেন-হাসানের কৃষাণ গোরা মিঞা রাখালদের মনসাঘট ভেঙে দেয়। সর্পদংশনে তুড়ুকরা মরতে লাগল। পরে দেবীর দয়ায় তুড়ুক পাড়ার বিপদ ঘুচল। হাসন তার এলাকায় মনসার মন্দির নির্মাণ করে। ব্রাহ্মণ নিয়োগ করে সেখানে পূজা দিলেন। একইভাবে আমরা দেখতে পাই মুসলিম সমাজেও পূজা প্রচার হতে থাকে। পঞ্চম পালার শেষার্ধে আবার দেবী চাঁদ বণিকের রাজ্যের দুই জেলে জালু-মালুর ঘরে স্বর্ণঘট নির্মাণ করে পুজো প্রচারের আয়োজন করেন ঘটা করে। চাঁদের স্ত্রী সনকা ছয়পুত্রবধূকে নিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং ঘরে ফিরে এসে ঘট নির্মাণ করে পূজা করে। ভৃত্য নেড়ার মাধ্যমে উক্ত সংবাদ জানতে পেরে হেতালের লাঠি দিয়ে ঘট ভেঙে দেয়। চাঁদের এই দুর্ব্যবহারে দেবী ভয় পেয়ে নেতার সঙ্গে যুক্তি করে সনকার বোন মেনকা সেজে ছলনা করে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করে তার 'নাখরা বন' ধ্বংস করেন। পরে গোয়ালিনী বেশে (কমলা নাম নিয়ে) শ্রেষ্ঠ ওঝা ধন্বন্তরির স্ত্রী কমলার সঙ্গে সই পাতিয়ে রাত্রিবেলায় ওঝার মৃত্যুরহস্য জেনে তাকে বধ করে। শিষ্যরা কথামতো নিজেদের বাঁচার ও চাঁদের বাঁচার উপায় স্বরূপ ওঝার দেহ টুকরো টুকরো করে বোট নানা স্থানে পুঁতে দিতে পারে না। মনসা চক্রান্ত করে দেহ জলে ভাসিয়ে দিয়ে পাতালে তা লুকিয়ে রাখলেন। সপ্তম অধ্যায়ে আবার দেখি মনসার বিষ দৃষ্টিতে ধ্বংস হওয়া চাঁদের অন্তঃপুরের চন্দনগাছ সুবর্ণ চেঙ্গড়ার লোভে ধনা-মনা জিইয়ে দিলে মনসা তাদের বধ করে। পরে ধনামনার মায়ের সখী সেজে জিইয়ে দিয়ে তাদের নিয়ে দেবী পালিয়ে যান। সিজুয়া-পর্বতে এবং সেখানে নিজের সেবক করে রাখেন।

অষ্টম পালায় দেখা যায় মনসার সঙ্গে চাঁদ সদাগরের দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। ভাতের মধ্যে বিষ দিয়ে চাঁদের ছয় পুত্র নিধন করেন মনসা। ছয়পুত্রের মৃতদেহ সুঙ্গড়ির জলে ভাসিয়ে দিলে, শিবের মূর্তির বেশে চাঁদকে স্বপ্ন দেখান দেবী বাণিজ্য যাওয়ার জন্য। অন্যদিকে মনসা ইন্দ্রের সভায় গিয়ে অনিরুদ্ধ ও ঊষাকে মর্ত্যধামে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন দেবীর পূজা প্রচারের কারণে। স্বর্গের কামদেব ও রতির পুত্র অনিরুদ্ধ অভিশাপগ্রস্ত হয়ে মর্ত্যে চম্পকনগরের চাঁদ সদাগরের পত্নী সনকার গর্ভে পুত্র লখীন্দর হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং বান রাজার কন্যা ঊষা মর্ত্যে উজানি-নগরের সায়বেনের ঘরে সুমিত্রার গর্ভে বেহুলা নামে জন্মগ্রহণ করে। সনকা যখন পাঁচ মাসের গর্ভবতী সদাগর তাকে গর্ভপত্র দিয়ে পাটনে বাণিজ্য যাত্রা করে। চাঁদ বণিক গন্ধেশ্বরী, সর্বজয়া, জগদ্দল, সুমঙ্গল নবরত্ন, চিত্ররেখা, শশিমুখী প্রভৃতি সাতটি ডিঙ্গা নিয়ে বাণিজ্যে যান। এখানে কুমারহট্ট, হুগলি, ভাটপাড়া, কাঁকীনাড়া, মুলাজোড়, ভদ্রেশ্বর, চাপদানি, ইছাপুর, বাঁকিবাজার, নিমাই-তীর্থ,

খড়দেহ, রিসিড়া, কোননগর, কামারহাটী, ঘুসুড়ি, চিতপুর, কলিকাতা, বেতড়, কালিঘাট, চুড়াঘাট, বারুইপুর প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ রয়েছে যেগুলি আজও আমাদের কাছে চিরপরিচিত। কালিঘাটের মন্দিরে কালিপূজা দিয়ে চুড়াঘাট হয়ে বারুইপুরে পৌঁছালে দেবী তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করতে থাকেন। কালীদহে মনসা বিশ্বকর্মাকে দিয়ে পুরী নির্মাণ করেন এবং হেমঘট স্থাপন করেন। মনসা প্রেরিত নাগকুলের তাণ্ডবে কালীদহে ঝড়-তুষারের সৃষ্টি হয়। কিন্তু চাঁদ কর্ণধারদের কথা না শুনে একাই দেবী ও তার অনুচর সর্পকুলের অত্যাচারের প্রতিরোধে নেমে পড়েন। এখানে চাঁদ সদাগরের মুখে কবি —

> ‘‘চাঁদো বলে কর্ণধার দেখ বিদ্যমান
> মোর ভয়ে পলাইল জত নাগগণ।
> তুমি ত না জান ভাই আমার মহিমা
> কানির পরাণে কি করিতে পারে আমা।’’[৯]

চাঁদ মনসার বিচিত্রপুরীতে ঢুকে হেতালের লাঠি দিয়ে পদ্মার ঘট ভেঙে মন্দিরের ধন-রত্ন নিজ ডিঙ্গাতে তুলে নেন। কাঁকদহ, হাজাদহ-জোঁকদহ, সাপদহ, কড়িদহ ও শাঁখাদহের পাশ দিয়ে চাঁদ সদাগর গিয়ে পৌঁছায় অনুপম পাটনে। সেখানে রাজার সঙ্গে মিত্রতা করে ঝুনা নারকেলের বদলে শাঁখ, হলুদের বদলে সোনা, ধুতির বদলে পাটজোড়, পাঁচকুমড়ার বদলে কাঁচপাত্র নিয়ে ডিঙ্গা ভর্তি করে দেশে ফিরার আয়োজন করে।

এরপরে আমরা দেখি সনকার গর্ভে লখীন্দরের জন্মের কথা। লখীন্দর গর্ভে থাকাকালীন বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, জন্মের পরে অনুষ্ঠান, সোমাই পণ্ডিতের কাছ থেকে লখীন্দরের শিক্ষা শুরু হয়। এবং পরে লখীন্দরের অভিষেক হয়। মনসা সনকার রূপ ধরে চাঁদকে স্বপ্ন দেখিয়ে বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করেন। পরে হনুমানকে দিয়ে চাঁদ সদাগর ও তাঁর সপ্তডিঙা মধুকর ডুবিয়ে দেন। চাঁদকে বাঁচানোর জন্য দেবী তাঁর নাম লেখা বালিশ ও ভেলা পাঠালে চাঁদ তা গ্রহণ না করে হেতালের লাঠি দিয়ে বাড়ি মারে। পরে ধামাই নাগকে পাঠিয়ে চাঁদের হেতালের লাঠি কেড়ে নেন। আবার মনসা গৃহস্থ বধূর ছদ্মবেশে এসে চাঁদকে দেবীর পূজা করার কথা বলেন। মনসার কুচক্রান্তে চাঁদ নানা দুর্দশার মধ্যে পড়লেও সে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকে। নানা কষ্টের মধ্য দিয়ে ডাঙায় উঠে বারুইপুরে এসে পেটের দায়ে কাঠ বিক্রি করে। চৌতলে কলাচোপা খেয়ে প্রাণ বাঁচায় এবং ব্যাধদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়। কালিঘাটে চোরের কবলে পড়ে, হুগলিতে এক ব্রাহ্মণের গরু দেখাশোনার দায়িত্ব পায়। শেষে ত্রিবেণীতে এসে পাঁচ দরবেশের হাতে মার খেয়ে চাঁদ বন্ধু চন্দ্রকেতুর রাজ্যে গিয়ে

প্রবেশ করে। কিন্তু বন্ধু চন্দ্রকেতু মনসার ভক্ত ও দেবীর পূজা করে, তা শুনে চাঁদ বন্ধুর বাড়ি ত্যাগ করে।

বিপ্রদাসের কাব্যে নানা দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে চাঁদ উন্মত্ত পাগলের বেশে চম্পকনগরে প্রবেশ করেন। বিকৃতি আকারের চাঁদ ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকলে রাখালরা ভুল বলে গ্রামে রটিয়ে দেয়। চাঁদ বাঁচার জন্য তার প্রাসাদের মালিনী কাজলা রামার বাড়িতে নিজের পরিচয় দেয়। কিন্তু কাজলা মালিনী ভয় পেয়ে চাঁদের গায়ে আগুন ছুড়ে দেয়। কাঁদতে কাঁদতে চাঁদ নিজ প্রাসাদে গিয়ে কলা-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকে। ঝাউয়া দাসী ভুল সন্দেহে বাড়ির সবাইকে ডেকে আনে। উপায় না পেয়ে সনকার সামনে পরিচয় দিলে সদাগরকে সবাই চিনতে পারে। চাঁদ পুত্র লখীন্দরকে চিনতে পারে। রূপে-গুণে-বিদ্যাধর লখীন্দর অবিবাহিত জেনে পিতা তার বিয়ের আয়োজন শুরু করে। লখীন্দর বাসর ঘরে সর্পাঘাতে মারা যাবে জেনে বণিককুলের কেউ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হয় না। দেবী মনসা সনকার মাসি সেজে চাঁদের বাড়িতে এসে সায়বেণের কন্যা বেহুলার সম্বন্ধ নিয়ে আসেন নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। দেবীর ভাষায়—

> ''উজানি সাহের ঘরে আছে তার কন্যা
> বেহুলা তাহার নাম রূপে গুণে ধন্যা।''[১০]

অন্যদিকে উজানি নগরের সরোবরে বেহুলা সখীদের সঙ্গে জলকেলি করতে থাকলে মনসা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে আসে। বেহুলার পায়ের জল গায়ে পড়ার অজুহাতে অভিশাপ দেন বিয়ের রাত্রে বেহুলার বর মারা যাবে। পরিশেষে বেহুলা-লখিন্দরের বিয়ে স্থির হলে বাসররাতে লখীন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু হবে জেনে বেহুলার মা সুমিত্রা বিয়েতে অসম্মতি প্রকাশ করে। বেহুলা কিন্তু 'ললাট লিখন' বলে সবকিছু মেনে নেয়। তবুও সায়বেনে চাঁদ সদাগরকে মনসা পূজা করতে বলে। তার ফলে লখীন্দরের কোন মৃত্যু আশঙ্কা থাকবে না। প্রাণ গেলেও মনসা কানীর পূজা করবে না চাঁদ জানিয়ে দেয়। সনকাও লখীন্দরের বাসররাতে সর্পাঘাতে মৃত্যুর জন্য বিয়ে দিতে রাজি না হলে, চাঁদ সাঁতালী পর্বতে লোহায় বাসর-ঘর নির্মাণ করেন। সনকাকে চাঁদ আশ্বাস দেয় যে গুণবতী মেয়ে লোহার কলাই সেদ্ধ করেছে, সে নিশ্চয়ই স্বামীকে রক্ষা করতে পারবে।

বিপ্রদাস পিপলাই দ্বাদশ পালার নাম দিয়েছেন 'জাগরণ পালা' (সুকুমার সেন সম্পাদিত বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' কাব্যের দ্বাদশ পালায় আছে 'জাগরণ আরম্ভ')। এখানে মনসাদেবী ভয় দেখিয়ে কর্মকারকে দিয়ে সুতোর মতো সরু ফুটো রেখে দেয়, যার মধ্য দিয়ে সাপ অনায়াসে সাপ প্রবেশ করতে পারে। এখানে আমরা দেখতে পাই উজানি নগরের উদ্দেশ্যে বরযাত্রী যাত্রা করলে

নাগকুলের তীব্র গর্জনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বিবাহ চলাকালীন দেবী রথে চড়ে সমস্ত কিছু দেখতে থাকলে লখীন্দর চারিদিকে সাপ দেখে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। চাঁদ সদাগর শোকে কাতর হয়ে পড়ে এই দুর্ঘটনার জন্য। এই অবস্থায় বেহুলা প্রাণ ত্যাগের প্রতিজ্ঞা করলে দেবী লখীন্দরের চেতনা ফিরিয়ে দেন। আর শেষে বিয়ের নানা রীতি-নীতি সম্পন্ন হলে চাঁদ পুত্র ও পুত্রবধূকে সাঁতালি পর্বতে রেখে সেনাপতি ও ধন্বন্তরী ওঝাকে পাহারায় বসায়। কঠোর ব্যবস্থা সত্ত্বেও মনসার প্রেরিত কালনাগিনী লখীন্দরকে দংশন করলে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বেহুলা এখানে কালনাগিনীর লেজটুকু কেটে রেখে দেয়। চম্পকনগরে শোকের ছায়া নেমে আসে। সনকা পুত্র হারানোর জন্য স্বামীকে দোষারোপ করতে থাকে। পুত্র মারা গেলেও কানির সঙ্গে যে বিবাদ ঘুচেছে এই ভেবে চাঁদের মনে কোন অনুতাপ নেই। তবে বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে যেতে চাইলে সদাগর বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। সবার অনুনয়-বিনয় অগ্রাহ্য করে স্বামীকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে মনসা পুরীর দিকে রওনা হয়। পথে কাকের মাধ্যমে মায়ের কাছে নিজের আংটি পাঠিয়ে দেয়। সুমিত্রা পুত্রদের সঙ্গে করে এনে বেহুলাকে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু বেহুলা মায়ের অনুরোধ রাখে না। এরপর বিভিন্ন ঘাটে ধনাপুলা, গোদা, জনার্দ্দন, জুয়ার প্রভৃতিদের দুর্ব্যবহারকে এড়িয়ে, গৃধিনী-শকুনি, বাঘের হাত থেকে লখীন্দরের গলিত শবকে রক্ষা করে বেহুলা অবশেষে নেতার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। দেবী মনসা অবশ্য বেহুলাকে সাহায্য করেছেন এই দুর্গম পথে। মনসাদেবীর মন্ত্রণাদাত্রী নেতার সাহায্যে বেহুলা দেবপুরে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে দেবতাদের সামনে লাস্যনৃত্য করে শিবসহ সমস্ত দেবতাদের তুষ্ট করে পুরস্কার স্বরূপ স্বামীকে জীবিত করার প্রস্তাব রাখেন। শিবের নাতনির পরিচয় দিয়ে শিবের লোলুপ দৃষ্টি থেকে সে নিজেকে বাঁচায়। মনসা প্রথমে লখীন্দরের মৃত্যুতে সর্পদংশনের কথা অস্বীকার করলেও বেহুলা কালনাগিনীর কাটা লেজ দেখালে মনসা দুঃখে তার বারমাস্যা শুরু করে। চাঁদবেনের কাছে পূজা পাওয়ার প্রচেষ্টায় তাকে যে কত অপমানিত, লাঞ্ছিত হতে হয়েছে তা বারমাস্যার মধ্য দিয়ে অতি করুণভাবে দেবসভায় ব্যক্ত করেছেন কবি। দেবতাদের অনুরোধে 'নাগবাঁচা' মন্ত্রের সাহায্যে লখীন্দরকে বাঁচিয়ে তোলেন। সেইসঙ্গে বেহুলার ছয় ভাসুর ও শ্বশুরের সপ্তডিঙা মধুকরও ফিরিয়ে দেন।

সর্বশেষ পালায় অর্থাৎ ত্রয়োদশ পালায় আমরা দেখি-বেহুলার স্বামী-ভাসুরদের নিয়ে ফেরার পালা। দলপতি হিসাবে দুর্লভকে নিয়ে সাতটি ডিঙা আনে রামেশ্বর ঘাটে। আত্মীয়-পরিজন, ভৃত্য-দাসী সবাই চাঁদকে মনসাপূজার জন্য অনুরোধ করে। বেহুলা শ্বশুরকে পূর্ব জন্মের কথা বলে। দেবলোক থেকেই বেহুলা পদ্মার পূজারী। চাঁদের কারণেই অর্থাৎ চাঁদকে দিয়ে মনসাপূজা করানোর

জন্যই যে দেবলোকের বাণরাজার কন্যা ঊষা চম্পকনগরের বধূ বেহুলারূপে এসেছে তা স্পষ্ট বলে। চাঁদ মনসার পূজা না করলে তারা সকলেই আবার দেবপুরে ফিরে যাবে তাও বলে। চাঁদ সগাদর শেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সমস্ত পরিবারকে প্রাসাদে ডাকে মনসা পূজার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। চাঁদের মনসাপূজার চিত্র আমরা পাই সুন্দরভাবে—

'ঘৃত দধি শর্করা নৈবেদ্য দশ ফল
নানা পুষ্প আনিল কমল শতদল।
ছাগল মহিষ মেষে আনি শতে শতে
স্নান তর্পন রাজা কৈল বিধিমতে।
ছবি চিত্র আলিম্পনা দেখিতে সুন্দর
সিজের পল্লব দিল ঘটের উপর।
শুভক্ষণে দেব-দ্বিজ বন্দে সন্বিধানে
মন্ত্র পড়ি শিক্ষা বান্ধে বিপ্রদাস গানে।।"[১১]

মনসাদেবী যে দেবাদিদেব শিবের অংশ, হাতজোড় করে দেবীর স্তুতি করে নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়। এই স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে চাঁদ সদাগরকে বর দান করে। দেবীর নামে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে শেষে লখীন্দরকে কোলে তুলে নেয় চাঁদ।

অন্যদিকে মনসা বেহুলাকে পূর্বজন্মের কথাবলেন এবং সমস্ত কর্তব্য পূর্ণ হয়েছে জেনে মুক্তিলাভের কথা বলেন। বেহুলা-লখীন্দরের শাপমুক্তি ঘটে স্বর্গে গমনের সময় 'জুগিয়া-জুগিনি' বেশে সায়-বেনের ঘরে বিদায় গ্রহণ করতে যায়। স্বর্গে ফিরে গেলে দেবতারা অনিরুদ্ধ-ঊষাকে পরীক্ষা করার জন্য দুজনের কাঁকালে ভারি পাথর বেঁধে অথই জলে ফেলে দেন। দেবীর কৃপায় সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আবার তাদের আগুনে ফেলে পরীক্ষা করেন। দেবী এই বিপদ থেকেও তাদের উদ্ধার করে। এইভাবে নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে বেহুলা-লখীন্দর অর্থাৎ ঊষা-অনিরুদ্ধ ইন্দ্রের সভায় স্থান পায়। সবশেষের কবিতাটিতে 'অষ্টমঙ্গলা' গীত হয়েছে। দেবসভায় দেবরাজ ইন্দ্র মনসাদেবীর পূজা প্রচার মর্ত্যে কীভাবে হয়েছে তা জানতে চাইলে মনসা সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। অর্থাৎ সমগ্র মনসা কাহিনীর সারসংক্ষেপ মনসার মুখে বর্ণনা করেছেন কবি বিপ্রদাস পিপলাই।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা এবং বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে বিপ্রদাস

পিপলাই-এর মনসাদেবী সম্পর্কে যা মন্তব্য করেছেন তা এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন—

> ''বাংলা মনসামঙ্গলে মনসার চরিত্র অতি কঠোর ও নির্মম,— মাঝে মাঝে ঘৃণ্য নীচতার ধার ঘেঁষিয়াও গিয়াছে। কিন্তু বিপ্রদাসের কাব্যে মনসা চরিত্রে একটা অভিনব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এই চরিত্রে করুণা ও স্নেহ-মমতা সঞ্চার বিপ্রদাসের অন্যতম প্রশংসনীয় কৃতিত্ব।''[১২]

আমরা দেখতে পাই হাসন-হোসেন পালায় হাসন দেবীর পূজা করলে দেবী তার প্রতি ব্যথিত হন এবং মধুর স্বরে দয়া-স্নেহ-মমতা প্রকাশ করেন। জন্ম থেকেই দেবী গৃহহারা, পদ্মবনে জন্ম, পিতার সঙ্গে নিজের বাড়ি এলে সৎমা চণ্ডীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাঁধে। যার ফলে হারাতে হয় একটা চোখ। দেব সভাতেও তার কোন স্থান নেই, সকল দেবতা তাকে অবহেলার চোখে দেখে। সেই মনসা চম্পক নগরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব চাঁদ বণিকের কাছে পূজা পেতে গেলেও নানা ছলনার আশ্রয় নিতে হয়। মর্ত্যভূমিতে পূজা আদায় করতে গিয়ে দেবীর রুঢ়তা, কঠোরতা প্রকাশ পেলেও কাব্যে দেবীর অসহায় ও করুণাময়ী রূপও প্রকাশ পেয়েছে। বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসাবিজয়'-এর তৃতীয় পালায় দেবীর এক করুণ চিত্র পাই—

> ''পরিনু নাগের আভরণ।
> ডরাইল ঋষির নন্দন।
> সতাই হইল দুরবার
> দেবপুরে করিল খাঁখার।
> তাহে প্রবোধিব কি বলিয়া
> কেন ঋষি না গেনু গোড়াইয়া।
> জন্মিয়া নহিল কিছু সুখ
> কতেক সহিব মন দুঃখ।''[১৩]

শিবভক্ত চাঁদ চরিত্রের মধ্যেও একনিষ্ঠতা, বলিষ্ঠতা, দৃঢ়তার পাশাপাশি শেষে লৌকিক দেবী মনসা যে শিবেরই কন্যা তা জেনে অনুতপ্ত হয়। শেষে নানা উপাচারে, যজ্ঞের মাধ্যমে মনসাপূজা দেয়। চাঁদের মধ্যে বিনয়ী ভাব প্রকাশ পেয়েছে। বেহুলার পতিব্রতা, একাগ্রতা, সাহসিকতা, ধৈর্য্যশীলতার দিকগুলি প্রকাশ পেয়েছে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে। সবমিলিয়ে বলা যায় বিপ্রদাস পিপলাই-এর মনসাবিজয়ের 'দেবখণ্ডে' পুরাণ প্রসঙ্গের বর্ণনা, সেখানে দেবী মনসার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেমন সুন্দরভাবে এসেছে। তেমনি নরখণ্ডের চাঁদ সদাগরের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্বের বিভিন্ন ঘটনাধারার

বর্ণনায় বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। কবি নিজে তাঁর কাব্যকে মনসার ব্রতকথা বলে উল্লেখ করলেও মনসামঙ্গলের এক নিটোল কাহিনী তাঁর কাব্যে পেয়ে থাকি আমরা।

বিজয়গুপ্তকে আমরা মনসামঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে পূর্ববঙ্গের সর্বাধিক প্রচারিত কবি হিসেবে পেয়ে থাকি। তিনি পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন— মাতা রুক্মিনীর গর্ভে, পিতা সনাতনের ঔরষে। শ্রাবণ মাসের রবিবারে, রাতের তৃতীয় প্রহরে স্বপ্ন দেখেন কবি মনসা দেবীর। সেখানে দেবী তাকে আদেশ দেন কাব্য রচনা করার জন্য। দেবীর আদেশে তিনি **'পদ্মাপুরাণ'** কাব্য রচনা করেন পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে। পদ্মপুরাণের রচনাকাল সংক্রান্ত একটি উদ্ধৃতি আমরা এখানে তুলে ধরতে পারি—

> ''ঋতু [শ] শী বেদ শশী পরিমিত শক।
> সুলতা [ন] হুসন রাজা পৃথিবীপালক।''[১৪]

অর্থাৎ ঋতু-৬, শশী-১, বেদ-১, শশী-১ = ৬১৪১ অঙ্কস্য বামাগতিতে হয় ১৪১৬ শকাব্দ এবং ১৪১৬ + ৭৮ = ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ, বাংলার হুসেন শাহের রাজত্বকাল। গল্পরস সৃজনে, করুণরস ও হাস্যরস প্রয়োগে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের পরিচয়ে, চরিত্র চিত্রণে, এবং পাণ্ডিত্য প্রয়োগে 'পদ্মাপুরাণ' জনপ্রিয় কাব্য।

মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুযায়ী বিজয়গুপ্ত দেবদেবীর বন্দনা দিয়ে তার কাব্য শুরু করেছেন। এরপরে ধারাবাহিক ভাবে চব্বিশটি পালা রচনা করেছেন। সেগুলি হল—

১. স্বপ্নাধ্যায় পালা
২. মনসার জন্ম পালা
৩. চণ্ডীর সহিত শিবের সাক্ষাৎ ও বিবাদ
৪. মনসাকে চণ্ডীর দর্শন ও প্রহার
৫. পদ্মার বিবাহ
৬. বিচ্ছেদ পালা
৭. সমুদ্র মন্থন
৮. পদ্মার বনবাস
৯. রাখয়াল বাড়ীর পূজা
১০. কাজির সহিত যুদ্ধ

১১. গুয়াবাড়ি কাটা পালা

১২. মহাজ্ঞান হরণ

১৩. সঙ্কুর গাড়রি নিধন

১৪. ছয় কুমার বধ। ঝালবাড়ি পূজা

১৫. বরের পালা

১৬. অনিরুদ্ধ ঊষাহরণ ও যমযুদ্ধ

১৭. চাঁদ সদাগরের দক্ষিণ পাটন গমন

১৮. বস্তু বদল

১৯. বস্তু বদল পালা

২০. ডিঙ্গা বুড়ান, চান্দের অবস্থা ও লক্ষ্মীন্দ্রের জন্ম

২১. লক্ষ্মীন্দ্রের বিবাহের জুড়ানি

২২. লোহার বাসর গঠন

২৩. লক্ষীন্দ্রের বিবাহ

২৪. লক্ষীন্দ্র দংশন, ভাসান, জিয়ান

বিজয়গুপ্ত তাঁর 'পদ্মাপুরাণে' স্বপ্ন্যাধ্যায় পালার পরে মনসার জন্ম পালাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় শিব-পার্বতী-মনসা সংক্রান্ত পৌরাণিক কাহিনী।

পরম সুন্দরী অযোনীসম্ভবা কন্যা মনসা মহাদেবের মনসাকন্যা হিসেবে দেবগণে নাম রাখেন মনসা। অন্যদিকে পদ্মবনে উৎপত্তি বলে পদ্মাবতী নামে পরিচিত। আবার পাতালপুরীতে নাগিনীকন্যা রূপে জন্ম বলে বিষহরি নামেও খ্যাত। মনসার জন্ম পালায় আমরা দেখি পদ্মবনে মহাদেব মদনবাণে জর্জরিত হয়ে কামপ্রস্তাব দিলে লজ্জিত পদ্মা পিতার উদ্দেশ্যে বলে—

> ''আপনে সকল জান আমি বলিব কি।
> বাপ হইয়া না চিনিলা আপনার কি।।
> চরণে পড়িয়া আমি করি নমষ্কার।
> এমত কুশ্চিত কথা না বলিও আর।।''[১৫]

পরে শিব নিজের ভুল বুঝতে পেরে কন্যা মনসাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসলে, সৎমা চণ্ডীর আক্রোশের কবলে পড়তে হয়। মনসা তাকে নিজের দুঃখের কথা বললেও চণ্ডীর হাত থেকে নিস্তার পায় না। কবি বিজয়গুপ্ত মনসার মিনতি ভরা করুণ চিত্র বর্ণনা করেছেন এখানে— মা ভাই

ছাড়া দুঃখী এই মনসাকে পিতা মহাদেব সৎ-মা চণ্ডীর ভয়েই লুকিয়ে রেখেছিলেন। মা সম্বোধন করে মাটিতে দেহ রেখে পায়ে প্রণাম করেন তবুও দেবী চণ্ডী সদয় হননি। কবির ভাষায়—

''মা ভাই কেহ নাই মনে বড় তাপ।
তোমার কোপ দেখিয়া লুকাইয়া থুইল বাপ।।
... ...
চরণে পড়িয়া পদ্মা ভুমে দিল পাড়ি।
তথাচ দারুণ চণ্ডী পদ্মারে নহে এড়ি।।''[১৬]

হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও চণ্ডী মনসাকে অসহ্য প্রহার করে ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনসা কর্তৃক চণ্ডী প্রাণ হারান। পরে অবশ্য মহাদেব ও দেবগণের অনুরোধে চণ্ডী পুনরায় জীবিত হন। এখানে মনসার মঙ্গলীয় ভাব থেকে নাগিনী মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

মুনি জরৎকারুর সঙ্গে মনসার মহাসমারোহে করে বিয়ে হলেও, কোন্দলের ফলে মুনি মনসার বিষে আক্রান্ত হন। এবং প্রাণ ফিরে পেলেও স্বামী তাকে ত্যাগ করে তপোবনে চলে যান।

মনসা ক্রোধান্বিত হয়েও মুনি তাকে ত্যাগ করতে চাইলে ক্ষমাপ্রার্থী হয় এবং মুনি দেবীকে পুত্র বর প্রদান করেন।

''অপরাধ ক্ষমা কর রাখ রাঙ্গা পায়ে।
স্ত্রী লোকের অপরাধ ক্ষমিতে উচিত হয়ে।।
করুণা শুনিয়া কহে মুনি তপোধন।
তপ করিতে যাই আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ।।'
... ...
... ...
আমার সন্তান হবে তোমার উদরে।
আস্তিক হইবে নাম জগত ভিতরে।।
তক্ষকের শাপ হইয়াছে অষ্ট নাগের তরে।
তাহারা আসি জন্ম হইব তোমার উদরে।।''[১৭]

দেবতাগণের সমুদ্র মন্থন অংশে দেবী পদ্মাবতীকে আহ্বান না করলে ক্রোধে অমৃতকে গরলে পরিণত করে। আবার সেই গরল পান করে পিতা মহাদেব ঢলে পড়লে করুণাময়ী সর্বহারা নারীর কণ্ঠস্বর শুনা যায়—

''জন্মিল কমল বনে তুষ্ঠ হইল দেবগণে
সতাই করিল বিড়ম্বন।
আনি মুনির নন্দন মোরে কৈলা সমর্পণ
ছাড়িয়া গেলা মনি তপোবন।।
সতাই সঙ্গে বাদ হইল বাম চক্ষু কানা কৈল
সেই কথা ঘোষে সর্ব্ব লোকে।
মোর সম দুঃখী জন আর নাহি ত্রিভুবণ
প্রাণ মোর যায়ে তোমার শোকে।।
দৈবে এত কৈল মোরে তাহে কেন বাপু মরে
কেন হেন করিলা নারায়ণ।''[১৮]

অন্যদিকে পিতা নৌকস পর্বতে বনবাসে দিলে পিতৃবিচ্ছেদের কাতর হয়ে পড়েন মনসা—

''বাপ হইয়া বনে দিবা বল হেন বাণী।
কিরুপে রহিব আমি হইয়া একাকিনী
... ...
কান্দিতে কান্দিতে পদ্মা হইলা অচেতন।
পদ্মার কান্দনে কান্দে দেব ত্রিলোচন।।''[১৯]

ধীরে ধীরে মনসা নেতার যুক্তিতে মর্ত্যভূমিতে পূজা পাওয়ার অভিলাষী হন। যতিরূপে রাখয়ালদের কাছ থেকে পূজা আদায় করেন, হোসেন ও হাসান কাজীর সঙ্গে যুদ্ধ করে পূজা আদায় করেন এবং শেষে দেবী মনসা চম্পক নগরের বণিক শ্রেষ্ঠ চাঁদ সদাগরের কাছ থেকে পূজা পাওয়ার জন্য অভিলাষী হয়ে ওঠেন। মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান দুটি চরিত্র দেবী মনসা ও বণিক প্রধান শিব পূজারী চাঁদ সদাগরের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে কাহিনী ধারা এগিয়েছে এখানে। অর্থাৎ দেবতার সঙ্গে মানবের লড়াই। সেই সঙ্গে সনকা, বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী এসেছে। তবে মধ্যযুগের মনসামঙ্গলে দেখি মনসার পূজা প্রচারই মুখ্য । তাই মর্ত্যভূমিতে পূজা প্রচারের জন্য চাঁদ সদাগরকে উদ্দেশ্য করেন। শিশুকাল থেকে মনসার পূজারী সনকা (পদ্মাপুরাণে' সোনকা, সোনেকা ব্যবহৃত হয়েছে) ঘট নির্মাণ করে দেবীর পূজা দিলে চাঁদ সদাগর হেতালের লাঠি দিয়ে সেই ঘট খণ্ড খণ্ড করে ফেলেন। দেবী ভীত হয়ে পড়েন এবং নেতার সঙ্গে যুক্তি করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কবির ভাষায় উঠে এসেছে—

''দোহাতিয়া বাড়ি মারে ঘটের উপরে।
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে ঘরের ভিতরে।।
এত দেখিয়া পদ্মা পাইল বড় ডর।
পূজা এড়ি মন [সা] উঠিয়া দিল লড়।।''[২০]

এরপরে ক্রোধে দেবী চাঁদের গুয়াবাড়ি ধ্বংস করেন, নটী বেশে ছলনা করে মহাজ্ঞান হরণ করেন। কিন্তু মনসা চাঁদের অটল, স্থির সংকল্পকে সরাতে পারেন না। এর ফলে মনসা সঙ্কুর গাড়রিকে মারার সংকল্প করেন। নানাভাবে ছলনা করে শেষপর্যন্ত সঙ্কর গাড়রির স্ত্রী কমলার মাসি সেজে ওঝার মৃত্যু রহস্য জেনে নেন। ওঝার মৃত্যু হলে চাঁদ সম্পূর্ণরূপে অসহায় হয়ে পড়েন। পরে আমরা দেখি বিজয়গুপ্তের কাব্যে চাঁদের ছয়পুত্র নিধনের পথে দেবী নিজেই গোয়ালিনী বেশে দই বিক্রি করতে আসেন। অপরিচিত গোয়ালিনীর কাছ থেকে দই নিতে সনকা নিষেধ করলেও পুত্রদের কান্না ও জেদের বশে দই কিনেন। ভাতের সঙ্গে দই খেয়ে ছয় পুত্র মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ছয় পুত্রের হারানোর মর্মভেদী শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সনকা। মহাজ্ঞান হরণ থেকে শুরু করে ছয় পুত্র নিধন সমস্ত পরিকল্পনাই চাঁদের শক্তিকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে করেন মনসা। এই সমস্ত মর্মান্তিক ঘটনায় বিলাপ করলেও শিবভক্ত চাঁদ মনসা পূজার জন্য রাজী হননি। সোমাই পণ্ডিতের নির্দেশে কলার মান্দাসে করে ছয় পুত্রের মৃতদেহ জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ছয় বিধবা পুত্রবধূ ও সনকার কান্নায় শোকের ছায়া নেমে আসে চাঁদের বৃহত্তর প্রাসাদে। সনকা পুত্রদের হারিয়ে গভীর অরণ্যে অবিরাম কেঁদে বেড়ান। বিজয়গুপ্তের কাহিনীতে এরপর ধীবর জালু-মালুর প্রসঙ্গ রয়েছে। জালুর মাকে স্বপ্ন দেখান দেবী, তাদের জালে সুবর্ণ ঘট হিসেবে ধরা দিয়েছেন এবং প্রচুর ধন-সম্পত্তি দান করেন। এই জালু-মালু মনসার ঘট নির্মাণ করে, যেখানে সনকা ছয় বিধবা পুত্রবধূ ও সমাই পণ্ডিতকে নিয়ে মনসা পূজা করেন। মনসা সন্তুষ্ট হয়ে সনকাকে পুত্র বর দেন। কিন্তু সেই পুত্রকেও উটানিতে বা অন্নপ্রাশনে বা চূড়া অনুষ্ঠানে ফিরিয়ে নিতে চান মনসা। সনকা শেষে কায়দা করে বিয়ের রাতে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেন এবং মনে মনে স্থির করেন পুত্রের বিবাহ দিবেন না। এরপর মনসা দেবসভায় গিয়ে শিবের কাছ থেকে বান রাজার কন্যা ঊষা ও কামদেবের পুত্র অনিরুদ্ধকে মর্ত্যে আনার ব্যবস্থা করেন নিজের পূজা প্রচারের জন্য। চম্পক নগরে সনকার গর্ভে লখীন্দর রূপে অনিরুদ্ধ ও উজানিনগরে সায়বেনের ঘরে সুমিত্রার গর্ভে জন্ম হয় ঊষার বেহুলা নামে। তবে দেব সভায় মনসার এ হেন আচরণ যে মোটেই পছন্দসই নয়, তা উঠে এসেছে অতি নিপূণ হাতে। ঊষা, অনিরুদ্ধ যখন নাচে গানে দেব সমাজে আনন্দের আবহ সৃষ্টি করেছিল, মনসার আকস্মাৎ দেবসভায় প্রবেশকে

নিয়ে দেবতাদের ভাবভঙ্গি কবি বিজয়গুপ্ত খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন—

''দেখিয়া সকল দেবে মাথে দিল হাত।
না জানি সভাতে আজি কি হবে প্রসাদ।।
... ...
বাপের অনাদরে পদ্মার স্থির নহে মন।
সভা মধ্যে নিজ মূর্তি হইলা তখন।।''[২১]

চাঁদ দক্ষিণ পাটনে যান ছয় পুত্রের মৃত্যুর পরে। গর্ভবতী সনকা সমাজ সম্পর্কে নানা আশঙ্কা প্রকাশ করলে চাঁদ সদাগর স্ত্রীকে অভয় দান করেন। শেষে চাঁদ স্ত্রীকে গর্ভপত্র লিখে দিয়ে দক্ষিণ পাটন যাত্রা উপলক্ষ্যে মনসা ছাড়া সব দেবদেবীর পূজার্চনা করেছেন।

নানারকম দ্রব্যে চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর গঙ্গাচরণ, সিন্দুর কাটুয়া-হাসমড়া-মগর-ধুতুরার ফুল-গৌরাঙ্গ-সমুদ্র-উথাল-সুমদ্র বহাল-সপ্তচর-গরুড় মহারথী-িসংহমুখ-চন্দ্ররেখা প্রভৃতি) সাজিয়ে যাত্রা শুরু করেন। ধনার কথানুযায়ী বণিক শ্রেষ্ঠ চাঁদ দক্ষিণ রাজ্যে যাত্রা করা মনস্থ করেন। যেখানে 'সোনার কাঁচি দিয়ে দাত্তালে ধন দায়ে' এবং 'হীরামন মাণিক্য' রৌদ্রে শুকায়। দক্ষিণ রাজ্যে যাত্রা শুরু করে কালীদহের সমুদ্র পেরিয়ে লবনাম্বু সমুদ্র এড়িয়ে জম্বুদ্বীপ সাগরে পড়ে। সেখানে জোক ও সঙ্কের ত্রাসকে দূরে ঠেলে আরো কিছুটা এগিয়ে মনসার পূরী দেখতে পান। সেখানে কৈবর্ত্তের মুখে ধূপ দীপ দিয়ে মনসা পূজার কথা শুনে ক্রোধে চাঁদের দুই চোখ থর থর করে কাঁপে। হেতালের লাঠি দিয়ে মনসার পুরী ভেঙ্গে ফেললে দেবী মনসার মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা ও পূজা পাওয়ার প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে। কবির ভাষায় আমরা পাই—

''ঘরে থাকি পদ্মাবতী চাহে ক্রুদ্ধমতি।
বানিয়া কুলেতে আমি রাখিবম খ্যাতি।।
বানিয়ার না রাখিব বিচের বাইগন।
এহার প্রতিফল আমি দিব এইক্ষণ।।
... ...
'না পুজিলে ধনে জনে সাগরে করি তল।
এতেক ভাবিয়া পদ্মা অন্তরে বিকল।।''[২২]

দক্ষিণ পাটনে পৌঁছে সদাগর নারকেল সহ নানা দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করে রাজাকে সন্তুষ্ট করেন। রাজার সঙ্গে মধুর বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে পুনরায় আসবেন বলে বিদায় নেন। এখানেও চাঁদ

সমস্ত দেবতার পূজা করলেও বিষহরীর পূজা করল না। মনসা ক্রুদ্ধ হয়ে জানাল যে তাঁর পূজা না করলে সদাগর চম্পক নগরে ফিরে যেতে পারবেন না। চাঁদ এর প্রত্যুত্তর দেন যে, মনসাদেবী শক্তিবলে যদি চাঁদ সদাগরের অমঙ্গল সাধন করতে পারেন, তাহলে কেন নিজের কানা চোখ সারিয়ে তুলতে পারেন না? এখানে চাঁদের সঙ্গে মনসার সরাসরি সংঘাত শুরু হয়েছে।

চাঁদের বিদ্রুপে দুঃখিত, ব্যথিত মনসা নেতার পরামর্শ মতো পিতা শিবের সম্মতি আদায় করেন তাকে ধনে জনে ডুবিয়ে দুর্গতি করার। গঙ্গা ও ঐরাবতের সাহায্যে কালীদহের জলে চাঁদের চৌদ্দডিঙ্গা মধুকর নিমজ্জিত করেন দেবী। ধনজন সমস্ত গঙ্গার কাছে গচ্ছিত রেখে চাঁদকে কূলে তুলতে ব্যস্ত হন। তবে সাতদিন সাতরাত্রি জলে ভেসে থেকে বিবসনা চাঁদ কূলে উঠেই মনসার কুকর্মকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন। তার দেওয়া নেতের কাপড় ছুড়ে ফেলেন এবং প্রথমে দেব মহেশ্বরের ভজনা করে বাবকের অন্ন খাবেন বলে স্থির করেন চাঁদ। জাতি-নাশের ভয়ে মনসা সেই অন্ন সরিয়ে দেন এবং চাঁদের পাওয়া কলার বাকলও সরিয়ে ফেলেন। ক্ষুধার্ত চাঁদ তার এই দুর্দশার জন্য মনসাকে দায়ী করে ক্রুদ্ধ হন। পরে ক্ষুধার তাড়নায় কাঠ বিক্রি করতে গেলে, সেই কাঠ সর্পে পরিণত হয়, ফেরৎ দিতে হয় কুমোরের বউ-এর চার পণ কড়ি এবং কুমোরের হাতে বেদম প্রহার খায়। এত দুর্গতির পরেও ক্ষুধায় হীনবল চাঁদ নগরের জগাই মণ্ডলের ধান নিড়ানোর কাজে নিযুক্ত হন দু'মুঠো ভাত পাবার আশায়। কিন্তু দেবীর মায়াজালে ঘাস না কেটে ধান গাছ কেটে ফেলেন কাঁচি দিয়ে।

চাঁদ সদাগর বনের মধ্যে কাঠ ভাঙতে গিয়ে পাকা কাঠাল পেয়ে খেতে গেলে মনসার কপটে কাঠাল ভিঙ্গুলের বাসা হয়। কবি বিজয়পুপ্তের ভাষায় উঠে এসেছে—

> ''কাঁঠাল পাইয়া চান্দো মনে বড় আশা।
> মনসার কপটে হইল ভিঙ্গুলো বাসা।।
> শিব পূজা করি চান্দো কাঁঠাল খাইতে চায়।
> নাকে মুখে চৌক্ষে তারে ভিঙ্গুলে কামড়ায়।।''[২৩]

এইভাবে দেখা যায় চম্পক নগরের ঐশ্বর্য্যশালী বণিকশ্রেষ্ঠ চাঁদ চরম দুর্দশার মধ্যে অভুক্ত অবস্থায় দিন যাপন করতে থাকেন।

অন্যদিকে আমরা দেখি চাঁদের পত্নী সনকার সাধভক্ষণের বিভিন্ন আড়ম্বর। চম্পকনগরে লখীন্দরের জন্ম ও উজানি নগরে বেহুলার প্রসঙ্গ। এই সময় চাঁদ মিতার সাক্ষাৎ পেয়ে তার সহায়তায় দোলায় করে বাড়ি ফেরার রাস্তায় অষ্টনাগের প্রহার খান। ভূমিতে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়ে যান। চোখের দৃষ্টি হারিয়ে নিজ রাজ্যের লোকজনকে চিনতে পারেন না। পরে সদাগর শ্রীকলার হাটে

ভিক্ষাবৃত্তি করতে থাকেন।

এদিকে চম্পকনগরে সনকা চাঁদের দুর্দশার স্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠে। লখীন্দরের হাতে হেতালের লাঠি পেয়ে স্বামীর জীবনাবসান হয়েছে বলে সোমাই পণ্ডিতকে দিয়ে শ্রাদ্ধের আয়োজন করে। শ্রাদ্ধের দ্রব্যসামগ্রীর জন্য রতি ধাই শ্রীকলার হাটে বাজার করতে গেলে, চাঁদ দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে রতি ধাই-এর সাথে নিজ বাড়িতে এসে পৌঁছান। রতি ধাই খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে বললে চাঁদ পুষ্পবন দেখে আনন্দিত হন এবং সেখানে গেলে চোর ভেবে কোতোয়ালরা তাকে মারধর করে। পরে রতি ধাই তাকে চিনতে পেরে ভাত খেতে দেয়। এই পরিস্থিতিতে নেতা মনসাকে স্মরণ করিয়ে দেয় রতির অন্ন খেলে চাঁদের জাতি যাবে এবং মর্ত্যলোকে কেউই দেবীর পূজা করবে না। নেতার উক্তিতে—

> ‘‘চান্দোর দিব্যচক্ষু যদি এখন না দেও।
> মর্ত্ত্য লোকে তোমারে না পূজিব কেও।।
> এতেক শুনিয়া পদ্মা নেতার উত্তর।
> হাতে জল দিয়া ছান্দা ভাঙ্গিল সত্তর।।’’[২৪]

চাঁদের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে সবাইকে চিনতে পারেন এবং রতিকে তিরস্কার করেন ভাত দেওয়ার সাহসে। সনকা প্রথমে স্বামীকে চিনতে না পরলেও পরে বুঝতে পারে এবং নারীগণের জয়ধ্বনিতে চাঁদসদাগরের প্রাসাদ মেতে ওঠে।

নিজের বাড়ি ফিরে এসে চাঁদ পুত্র লখীন্দরের খবর জানতে পেরে পিতৃগৃহে তাকে কাছে টেনে নেন। ছেলের বিয়ে দিবেন বলে স্থির করেন। পরদিন সকালে পাত্রমিত্র ও সোমাই পণ্ডিতকে ডেকে পাঠিয়ে শুভক্ষণ স্থির করতে বললে সনকা শঙ্কিত ভাবে জানায় যে, মনসার বরপ্রাপ্ত লখীন্দরের বিয়ে দিতে সে রাজি না। বাসররাতে সাপে দংশন করবে বলে জগৎগৌরী মা মনসা জানিয়েছেন। কিন্তু শিবশম্ভু পূজারী মনসা বিদ্বেষী চাঁদ এই বক্তব্যকে তোয়াক্কা না করে বরং প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়ান। সনকাকে অভয় দান করেন। পাত্রী খোঁজার পালা চললে সোমাই পণ্ডিত দেবী দশভূজার পুত্রতুল্য সায় সদাগরের সুন্দরী কন্যা বেহুলার সঙ্গে লখীন্দরের বিয়ে দিতে বলেন। চাঁদ পাত্রমিত্র পুরোহিত নিয়ে সায়বেনের ঘরের দিকে রওনা দেন। উজানিনগরের ‘মুক্তাসার’ সরোবরের পাশে অবস্থান করে। এই সময়ে পদ্মার ছলনায় বেহুলা ‘মুক্তাসার’ স্নানে যেতে চায়। মাতা সুমিত্রা অনুমতি না দিয়ে বরং তিরস্কার করে। কিন্তু পিতার সায় পেয়ে বেহুলা মুক্তাসারে যায়। এখানে চাঁদ স্নানরত বেহুলাকে দেখে উৎফুল্লিত হয়। মনসা এখানে ব্রাহ্মণীর বেশে মুক্তাসার সরোবরের ঘাটে অবস্থান করে বেহুলার

পায়ের জল শরীরে পড়েছে বলে বিয়ের রাতে স্বামী মারা যাওয়ার অভিশাপ দেন। নাছোড়বান্দা বেহুলাও ভাগ্য বিচারের জন্য ডুব দিয়ে শঙ্খ-সিঁদুর তুলে শেষে পদ্মাবতীর মন্দিরে গিয়ে পুজো দেয়। বেহুলা আবার 'মরা সউল' জীবিত করে দিলে চাঁদ সদাগর লখীন্দরের উপযুক্ত কন্যা বলে স্থির করে। গণকেরা বেহুলা-লখীন্দরের বিয়ের দিনে স্থির করতে না পারলে নেতা নারদ মুনিকে গণকরূপে পাঠালে বিয়ের দিন স্থির হয়। সায়বেনের অনুরোধে সদাগর আহারে রাজি হলে লোহার কলাই সিদ্ধ করার কথা বললে বেহুলা লোহার সিদ্ধ করে চাঁদকে কর্মনিপূণতার জোরে মুগ্ধ ও আনন্দিত করে তোলে। এদিকে মনসা সনকার মাসির ছদ্মবেশে এসে লখীন্দরকে অভিশাপ দেয় বিয়ের রাতে কালসাপ দংশন করবে বলে। চাঁদ মনসা অনুমান করে হেতালের লাঠি নিয়ে পিছু পিছু যায়—

''কোপ মনে গেল চান্দো কোথা গেল বুড়ি।
পদ্মার প্রাণ কাঁপে যেন কলার বাগুড়ি।।
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া চান্দো হেতাল বাড়ি লাভে।
সভ্রমে পলায়ে দেবী সোনকার আড়ে।।''[২৫]

লখীন্দরের বিয়েতে বাঁধা আসলে এবং মনসার অভিশাপে সনকা ভয় পেলে চাঁদ সদাগর লোহার বাসরঘর নির্মাণ করেন। যেখানে বায়ু চলাচল করতে পারবে না, একটা পিঁপড়েও ঢুকতে পারবে না। তবুও মনসা কর্মকারকে ভয় দেখিয়ে সর্প প্রবেশের ছিদ্রপথ বানিয়ে নেন।

এরপর লখীন্দর বিয়ের নানা আচারবিধি মেনে উজানি নগরের দিকে বরযাত্রী নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বিজয়গুপ্তের কাব্যে দেখি বেহুলা ছোটবেলা থেকে মনসার পূজারী। তাই বেহুলার বিয়ের দিন দেবী সেখানে উপস্থিত হন। দেবতারা এই আচরণে শঙ্কিত হন এবং দেবী চণ্ডী মনসাকে কৌতুক করেন যাতে বেহুলা কাঁচা বাড়ি না হয়—

''বিবাহ করাব পুত্র নগর উজানি।
ছল করি ফিরে মোর লঘু জাতি কানি।।''[২৬]

বিবাহে লখাইয়ের মাথায় ছত্র ভেঙে নাগছত্র ধরলে তা থেকে লখাই ভয় পেয়ে যায় এবং মূর্চ্ছিত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। বেহুলা মনসার কাছ থেকে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মতো নিজের অধিকার আদায় করতে গেলে মনসা সেখানে ছলনার আশ্রয় নেয়। অসুস্থতার দোহাই দিয়ে বেহুলাকে সাহায্য করতে না চাইলে পরে বেহুলা কিছু যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে 'খণ্ড বিয়ান' ও 'অমৃতকুণ্ডের জল' আদায় করে মনসার কাছ থেকে। লখীন্দরকে সুস্থ করে তোলে। সেই সঙ্গে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে নিজের কাঁচুলিও

নির্মাণ করে নেয়। মন না চাইলেও মনসার কঠোর আদেশে কালনাগিনী লোহার বাসর ঘরে বায়ুকোণের ছিদ্রপথে গিয়ে লখীন্দরকে দংশন করে। নেতার মহাজ্ঞানে বেহুলার কালনিদ্রা পেলে মনসা তৎক্ষণাৎ তাকে স্বপ্নের মাধ্যমে জাগিয়ে তোলে, নিজেকে নিরপরাধ রাখার জন্য স্বপ্নে বেহুলার প্রতি মনসার উক্তি—

''নিদ্রা হতে উঠি দেখ তোমার প্রভুয়ে।
ঢলিয়াছে লখিন্দর প্রাণে নাহি মরে।।
কালিনাগ পলাইয়া যারে মোর অসন্তোষ।
কালি খাইল তোমার স্বামী মোর কিবা দোষ।।''[২৭]

লখীন্দরের মৃত্যুতে বেহুলার ক্রন্দন, সনকার হাহাকার ও চাঁদের ক্রোধ মিলে তীব্র শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয় চম্পক নগরে। চাঁদ লখীন্দরকে পুড়িয়ে দিতে বললে বেহুলার আকুল প্রার্থনায় ও সোমাই পণ্ডিতের কথায় কলার ভেলা তৈরী করান এবং লখীন্দরকে ভাসিয়ে দেয়। বেহুলাও কলার মাজুষে গিয়ে বসে। বেহুলা নানা ঘাট ঘুরে, নানা বাধাবিঘ্নের মাধ্যমে এগিয়ে চলে পথ। দেবী মনসা আবার নেতাকে বাঘরূপে পাঠিয়ে দেন গাঙ্গের কুলে লখীন্দরের দেহের মাংস খাওয়ার জন্য।

''পদ্মা বলে নেতা তুমি গাঙ্গের কুলে যাও।
বাঘ রূপে গিয়া তুমি লখাইর মাংস খাও।
অস্তি চর্ম খাইয় না থুইয় শেষ।
পাছে যেন বেউলা না পায় উদ্দেশ।।''[২৮]

নেতা কিন্তু বেহুলার পাতিব্রত্য দেখে তাকে বিপদে ফেলতে পারে নি। বরং অষ্ট নাগের লেজ কেটে মাংস বিসর্জন ও লখীন্দরের অস্থি সংরক্ষণের বুদ্ধি দেয়। বেহুলাকে নিজ বাড়িতে রেখে সহযোগিতা করলে মনসা নেতার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। নেতার পরমর্শে মনসা লখীন্দরকে জীবিত করার অঙ্গীকার করে। বেহুলা দেবসভায় নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে সকলের মন জয় করে, বেহুলা মহাদেবের কাছে স্বামীর প্রাণ ফেরানোর বর চায়। বেহুলার এই দুর্দশার কারণ হিসেবে মহাদেব মনসাকে ডেকে পাঠালে দেবী কপটতার আশ্রয় নেন। যা বিজয়গুপ্তের ভাষায় খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে—

''পদ্মা বলে কহি শোন নন্দী মহাকাল।
মাথা ব্যথা করে মোর গায়ে না বাসি ভাল।
বুঝিতে না পারি আজি শরীরের ভাও।

আমি তথা না যাইব তুমি ফিরি যাও।।”[২৯]

লখীন্দরকে হত্যার অপবাদ মনসা প্রথমে অস্বীকার করে বেহুলাকে নানা অভিশাপ দিলেও শেষ পর্যন্ত নিজ দুঃখে ভেঙে পড়েন দেবী। চাঁদবেনের সঙ্গে নানাভাবে দ্বন্দ্ব হওয়া সত্ত্বেও মনসার পূজা করতে সে নারাজ।

শেষে লখীন্দর ও একে একে বেহুলার ছয় ভাসুর, চাঁদের চৌদ্দ ডিঙ্গা ফিরিয়ে দেন মনসা। তবে চাঁদবেনে কর্তৃক নিজ পূজা করানোর অঙ্গীকার নেয় দেবী বেহুলার কাছ থেকে। কাব্যের শেষে দেখা যায়— সাতপুত্র ও ধন-জন পেয়ে বাম হস্তে চাঁদ মনসার পূজা করতে ইচ্ছাপ্রকাশ করে। পদ্মাবতী ও দেবী চণ্ডী এক হয়ে যায় কাব্যে। মনসার মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে এখানে দেবী চণ্ডীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে—

“এতেক শুনিয়া পদ্মা বিরস বদন।
চান্দোরে ডাকিয়া চণ্ডী বলিলা বচন।।
তোমার ঠাই কহি শুন চান্দ সদাগর।
এক মূর্তি-আমি সেই নাহি অন্যপর।।
সেই ব্রহ্মা সেই বিষ্ণু সেই মহেশ্বর।
কুবের বরুণ আদি চন্দ্র দিবাকর।।
পদ্মা আমি দেখ তুমি হই এক মূর্ত্তি।
এ বলিয়া সাক্ষাত হইল ভগবতী।।”[৩০]

চম্পক নগরের সম্ভ্রান্ত বণিক চাঁদসদাগরও নিজের ভুল বুঝতে পেরে মনসাকে জগতজননী পদ্মা আদ্যের দেবতা বলে অভিধায় ভূষিত করে, ছাগল-মহিষ বলিদান দিয়ে, পূজার আয়োজন করেন। হেতালের লাঠি কেটে ধূপের আয়োজন করে। কাব্যের শেষে পদ্মার সঙ্গে চাঁদের দ্বন্দ্ব সমাপ্ত হলে লখাই-বেহুলা স্বর্গে গমন করে, সেই সঙ্গে ছয় পুত্র ও ছয় পুত্রবধূ সঙ্গে নিয়ে চাঁদ সদাগর ও সনকাও স্বর্গে গমন করে।

অত্যন্ত সুগভীর সহানুভূতির সঙ্গে চরিত্রগুলির অঙ্কন বিজয়গুপ্তের কাব্যের একটি অন্যতম গুণ। আবার দেব চরিত্র মনসাকে আধ্যাত্মিক গৌরবের মোড়কে আবৃত না করে, তার মধ্যে হৃদয়হীনতা, আক্রোশ পরায়ণ, ছলনাময়ী রূপ যেমন প্রকাশ পেয়েছে। তেমনি আবার অন্যের দুঃখে কাতরও হয়েছেন। নিজের ভাগ্যের প্রতিও দুঃখিত হয়েছেন। অনায়াসেই প্রকাশ করেছে নিজেকে জন্ম দুঃখিনী বলে উল্লেখ করেছেন। কাব্যের শেষে বেহুলা এবং চাঁদ সদাগরের প্রতি অত্যন্ত

সহানুভূতিশীল হয়েছেন। সবকিছু মিলিয়ে দেবী নিজ অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করে চলেছেন। মনসাদেবী কোন অমঙ্গলের প্রতীক হয়ে ওঠেনি, বরং তার পরিপূর্ণ মানবী রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এখানে চাঁদের আদর্শ বড় হয়ে ওঠেনি। তাই বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যটি বাংলা সাহিত্যে অন্যতম সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। বিজয়গুপ্তকে বাস্তববাদী, সমাজ সচেতন, শিল্পবোধসমন্বিত রূপে পেয়ে থাকি উক্ত কাব্যের রচয়িতা রূপে। এই কাব্যে মনসাদেবীর দৈবিক দিকটি যেমন অঙ্কিত হয়েছে তেমনি মনসাদেবীর অবহেলিত জীবন থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য লড়াই আমরা দেখতে পাই। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মতে—

> ''পাঁচশত বৎসর যাবৎ বিজয়গুপ্ত বাঙ্গালীর চিত্ত-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। ইহা সামান্য গৌরবের কথা নহে। তাঁহার রচনা মেকী কিছুই ছিল না। খাটি বাঙ্গালী প্রাণের আকাঙ্খা তিনি মিটাইতে পারিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি এত আদর পাইয়াছেন।''[৩১]

আরো বলা যায় বিচ্ছিন্ন সামাজিক চিত্রগুলি বিজয়গুপ্তের কাব্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই দিক দিয়ে তাঁর মনসামঙ্গল তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসেরও একটি মূল্যবান দলিল। তিনি দেব-চরিত্রগুলিও তৎকালীন সমাজের এক একটি জীবন্ত মানব-চরিত্ররূপেই চিত্রিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে দেবত্বের লেশ মাত্র নেই। বাংলার ধুলিমলিন গৃহাঙ্গিনায় তাঁদের কাহিনীর পরিবেশটি রচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে কোন আদর্শবাদের স্পর্শমাত্র নেই। মনসা, চণ্ডী, মহাদেব প্রভৃতি দেব-চরিত্রগুলি নিখুঁত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই চিত্রিত হয়েছে। তাঁর কাব্যে বিভিন্ন ধরনের পালা বিভাগ থাকলেও প্রতিটি পালা এক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কাহিনী।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম তথ্যের খনি। ভাষা প্রাচীন ও কতটা অমার্জিত হলেও এই কাব্যের পত্রে পত্রে পল্লী-প্রাণের পুরান সত্তা পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের বরিশাল-নোয়াখালী, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলের ঘরে ঘরে বিজয়গুপ্তের কাব্য বহুল প্রচলিত। তাঁর লিখিত মনসার কাহিনী এখনও মানুষের প্রাণ জুড়িয়ে দেয়।

মনসামঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম প্রতিভাশালী কবি **নারায়ণদেব**। 'সুকবিবল্লভ' বা 'কবিবল্লভ' উপাধিযুক্ত পূর্ববঙ্গের এই কবির কাব্যের নাম **'পদ্মাপুরাণ'**। মনসামঙ্গল কাব্যধারার প্রাচীনতম কায়স্থ পূর্বপুরুষ রাঢ়দেশ ছেড়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে বোরগাঁও অর্থাৎ ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ থানার অন্তর্গত বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। নারায়ণ দেবের পিতামহের নাম নরহরি, পিতার

নাম নরসিংহ। মাতার নাম রুক্মিণী। কবিরা মধুকুল্য গোত্র এবং গুণাকর গাঁই। পূর্ববঙ্গ ছাড়া আসামে ও উত্তরবঙ্গে নারায়ণদেবের কাব্য বহুল প্রচারিত।

নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণ' তিনভাগে বিভক্ত। যথা—

প্রথমভাগে রয়েছে— আত্মপরিচয় ও দেববন্দনা,

দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে— পৌরাণিক আখ্যানের সমাহার,

তৃতীয় ভাগে রয়েছে— চাঁদসদাগর ও বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী।

তিনটি খণ্ডে বিভক্ত এই কাহিনীধারার মধ্যে কোন সংযোগ সূত্র নেই। অসংলগ্নভাবে এই কাহিনীর বর্ণনা পাই। শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে সুকবি নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণ'-এর সম্পাদনায় যে পুথিটি (ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত গোপালপুর অঞ্চলের অধিবাসী এবং হেমনগরস্থ আম্বারিয়া স্টেটের তদানীন্তন কর্মচারী শ্রীমান মহেন্দ্রনাথ দাসের কাছ থেকে প্রাপ্ত) নিয়েছেন তার মধ্যে যে শিরোনামগুলি দিয়েছেন, সেই সূত্র ধরে মনসাদেবীর পরিচয় আমরা তুলে ধরতে পারি। প্রথমেই আমরা পাই শিব-চণ্ডীর কথা। বৃষের সজ্জা করে শিবের যাত্রা শুরু হয়। পরে দেবী চণ্ডী ডুমুনী বেশ ধারণ করে শিবের কাছে গিয়েছেন। নদী পারাপারের সময়ে ঘাটে ডুমুনিকে শিবের মিলনের জন্য প্রস্তাব দিলে রতিক্রিয়ায় পরে দেবী নিজরূপে আবির্ভূত হন। শিব নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হন। এরপরে পদ্মবনে কামাসক্ত শিবের শরীরের ঘাম থেকে নেতার জন্ম হয়। মহাদেব নেতাকে কৈলাস শিখরে পাঠিয়ে দেন, চণ্ডী ও গঙ্গার কাছে। নারায়ণদেব তাঁর কাব্যে চণ্ডী ও গঙ্গা দুজনকেই মহাদেবের স্ত্রী হিসেবে দেখিয়েছেন। এগুলি তাঁর 'পদ্মাপুরাণে' নতুন সংযোজন। মনসার জন্মকথায় দেখা যায়, কামবানে জর্জরিত শিবের নির্গত বীর্য পদ্মপাতায় পড়ে। ক্ষেমা নামে এক পক্ষীনি অমৃত ভেবে পান করে। সেই মহাবীর্যের ভার পক্ষীনি সহ্য করতে না পেরে পুনরায় কালীদহে গিয়ে পদ্মাপাতায় রেখে আসে। পদ্মপাতা থেকে বীর্য পাতালে ভুবনে গিয়ে বাসুকির কাছে পৌঁছল। বাসুকি ধ্যানে মহাদেবের বীর্য জানতে পেরে 'কুর্ম্মে'র সঙ্গে যুক্তি করে 'নিম্মার্লি'কে আদেশ দেন চার হাত তিন নয়নের শিবের লক্ষণযুক্ত কন্যা নির্মাণের জন্য। এইভাবে পাতালপুরীতে মনসার জন্ম হয়। মনসাদেবীর সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে তার বৃত্তান্ত বলেন সুকবি নারায়ণদেব—

''আনন্ধিত নাগপুরি জর্ন্ম হইল বিষহরি
ঘটে জীব হইল দিষ্ঠান।
আগে রক্ত বির্য্য হইল তার পাছে মাংস হইল

দেবীর শরীর গঠিল ভাগে ভাগে।”[৩২]

এখানে কবি অতি সূক্ষ্মভাবে পদ্মার জন্ম বিবরণ দিয়েছেন কবি। দেবাদিদেব মহাদেব একসময় আবার পদ্মবনে মনসার মতো সুন্দরী নারীকে একা দেখে পরিচয় জানতে চেয়ে রতিসুখের জন্য আহ্বান জানান। মনসা মহাদেবকে পিতা সম্বোধন করে নিজেকে তাঁর দুহিতা/কন্যা পরিচয় দেন। মহাদেব কন্যার কথা যাচাই করার জন্য তাকে নিজ মূর্তি ধারণ করতে বলেন। পদ্মা বিভিন্ন নাগের হার, বসন, সঙ্খ পড়ে, নাগের খাট সিংহাসনে, নাগের বিছানায় শুয়ে, নাগের ঝারিতে জল ও নাগের বাটাতে পান খেয়ে ইত্যাদি ভাবে নাগ সজ্জিত হয়ে শিবের কাছে এসে বিষ নয়নে তাকালে শিব মূর্চ্ছা যান। পরে ইন্দ্র, নারদ এবং অন্যান্য দেবতারা স্তুতি করতে লাগলে দেবী অমৃত নয়নে মহাদেবের দিকে তাকিয়ে তাঁর চৈতন্য ফিরিয়ে আনেন। এরপর কন্যা অর্থাৎ পদ্মা নিজের বাড়িতে যেতে চাইলে একটি পুরী নির্মাণ করে শিব তাকে সেখানে থাকতে বলেন। কিন্তু মনসা সৎমার ভয় পান না, পিতার সঙ্গে যাবেনই। উপায় না পেয়ে মহাদেব বিশ্বকর্মাকে দিয়ে ফুলের সাজি বানিয়ে তার মধ্যে মনসাকে রেখে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন। নারায়ণদেবের কাব্যে মনসার প্রথমে গোয়াল নগরে পূজা প্রচারের কথা রয়েছে। গোয়ালনগরের গোচরণভূমিতে শিশুদের কাছে দেবী ক্ষীর চাইলে, শিশুরা অপরিচিত নারী দেখে না দিতে চাইলে দেবীর বিষ নয়নে সবাই সংজ্ঞা হারায়। শেষে গোপীনীরা কান্নায় ভেঙে পড়লে প্রাণ ফিরে পায় শিশুরা। এরপর মনসা হালুয়া বাছাইর গ্রামে যায়। ইছাই পাতরের ছেলে চাষী বাছাই সুন্দরী কুমারীকে দেখে বিয়ে করতে চায়। মনসা কোপবশত তার দিকে চাইলে বাছাই দেবীর সম্মুখে ঢলে পড়ে। বাছাই-এর মা মালতী অনেক অনুনয়-বিনয় করার পরে বাছাই প্রাণ ফিরে পায় তারা নতুন এই দেবীর পরিচয় জানতে চাইলে পদ্মা মহাদেবের কন্যা বিষহরি বলে নিজের পরিচয় দেন এবং পূজাবিধির কথা বলেন—

‘‘হংস ছাগল বেড়া পূজা দিয় মইস গেজা
নিতর্গিত মঙ্গল জয়কার।
চাঁপা কলা পঞ্চপাতে তিল চাউল দুগ্ধসাঁতে
কৈল তোরে পূজার বিস্তার।।
জন্ম মোর শ্রাবণ মাসে বিষ্ণু পঞ্চমী দিবসে
এথ পুজে এই তিথি পাইয়া।’[৩৩]

লক্ষ বলি দিয়ে বাছাই পূজা করে দেবীর কাছ থেকে বিদায় নেয়। অন্যদিকে শিব মনসাকে নিয়ে নিজের বাড়ি যান। গঙ্গা ও চণ্ডীর ভয়ে শিব মনসাকে ‘হিঙ্গুলালি ঘরে’ লুকিয়ে রাখলে নারদ দেবী

চণ্ডীর কাছে সেই সংবাদ পৌঁছে দেন। গঙ্গার সঙ্গে যুক্তি করে করণ্ডী বের করে পরম সুন্দরী মনসাকে দেখতে পান। আক্রোশে চণ্ডী মনসাকে প্রহার করেন। কুশের বাড়ি দিয়ে মনসার একচক্ষু কানা করেন। মনসা সহ্য করতে না পেরে বিষ দৃষ্টিতে তাকালে চণ্ডী চেতনা হারিয়ে ফেলেন। পরে শিবের অনুরোধে সুস্থ হয়ে ওঠেন চণ্ডী। নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণে'র দেবখণ্ডে যে মনসার কাহিনী তা এখানে হঠাৎ সমাপ্ত হয়েছে। দেবখণ্ডে মনসাদেবীর পরিচয় আমরা এর থেকে বেশি পাই না। আবার নরখণ্ডে চাঁদ সগারের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্বের চিত্র পরে বিচ্ছিন্নভাবে পেয়ে থাকি।

নারায়ণদেবের 'নরখণ্ডে' আমরা বেহুলা-লখীন্দরের বিবাহের চিত্র পাই। মর্ত্যলোকে মনসার যে পূজা পাওয়ার প্রচেষ্টা তা চাঁদ সদাগরকে কেন্দ্র করে। তাই বেহুলা-লখীন্দরের বিবাহে নানা বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করেন দেবী। উনকুটী নাগ উজানি নগরে গিয়ে বিয়ের আসরে লখীন্দরের মাথায় গিয়ে বসে। কাল সাপ দেখে ভয় পেয়ে লখীন্দর অচৈতন্য হয়ে পড়ে। ছয়পুত্র, বাণিজ্যের সমস্ত ধন সম্পত্তি, মানুষজন হারিয়েছে এবং শেষে লখীন্দরের পরিণতি দেখে চাঁদ সদাগর বিলাপ করতে থাকেন। এই সময় বেহুলার নানা মিনতি শুনেও মনসা 'আড়মুখ' করে থাকেন। উপস্থিত বুদ্ধি-সম্পন্না বেহুলা মনসাকে স্ত্রীবধের অপবাদের কথা বলেন। দেবী বেহুলার প্রতি সদয় হয়ে লখীন্দরের চৈতন্য ফিরিয়ে দেন। এর সঙ্গে আরো বলা উচিত যে বাণিজ্য বদল করে পাটন থেকে স্বদেশে ফেরার সময় চাঁদের চৌদ্দডিঙা ডুবিয়ে দেওয়ার ফলে দুর্দ্দশার মধ্যে পড়েও মনসাপূজা করতে রাজি হননি তিনি। পরে আবার বেহুলা-লখীন্দরের মাধ্যমে পূজা প্রচারের চেষ্টা করেন দেবী। বাসররাতে লখীন্দরকে কালনাগিনী সাপে দংশন করলে মৃত স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য গাঙ্গুড়ের জলে ভেলায় ভেসে যায় বেহুলা স্বর্গের উদ্দেশ্যে। নেতা ধোপানীর সাহায্যে স্বর্গে দেবসভায় গিয়ে উপস্থিত হয়। দেবসভায় শিবের আদেশে বেহুলা নৃত্য করে সকল দেবতাকে তুষ্ট করে, মনসাদেবীর সাহায্যে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনে। মহাদেবের আদেশে দেবী লখীন্দরের জীবন পুনরায় ফিরিয়ে দিলেও চাঁদের দ্বারা মনসাপূজা করিয়ে নেওয়ার শর্ত করিয়ে নেন। মনসামঙ্গলের গতানুগতিক কাহিনীর মতো নারায়ণদেবের মনসামঙ্গলেও শেষে বেহুলার অনুরোধে চাঁদ সদাগর মনসার পূজা দেন। বেহুলা-লখীন্দর (স্বর্গের ঊষা-অনিরুদ্ধ) শাপমোচনের পরে স্বর্গের পথে গমন করে। পথে উজানিনগরে সকলের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে স্বর্গে গিয়ে স্বস্থানে আসীন হয়।

নারায়ণদেবের মনসামঙ্গলে আমরা দেখতে পাই মনসা-কাহিনীকে পুরাণের মর্যাদায় ও গুরুত্বে উপনীত করতে চেয়েছেন কবি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীভূদেব চৌধুরীর মতে—

'সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং বর্ণনারীতির অসংলগ্ন
আঙ্গিক সত্ত্বেও নারায়ণদেবের কাব্যে
ভাব-কল্পনার সংহতি গাঢ়তর।'[৩৪]

নারায়ণদেবের মনসামঙ্গল সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে— চণ্ডীমঙ্গলে মুকুন্দরামের খ্যাতি যেমন অনেক প্রচারিত। তেমনি মনসামঙ্গলের অন্যতম প্রাচীন কবি নারায়ণদেবের কাব্য যে শুধু সমাজে প্রচারিত তা নয়, বাংলার বাইরে অসম প্রদেশেও প্রচার লাভ করেছে। নারায়ণদেবকে শিল্পরসের দিক দিয়ে মধ্যযুগের অন্যতম প্রতিভাশালী কবি বলে মনে করেছেন। তাই বলা যায় নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণে' নতুন নতুন ঘটনা ও গল্প সংযোজিত হওয়ার ফলে আখ্যানটি বিস্তৃত হয়েছে। আর এই 'পদ্মাপুরাণই' বাংলার বাইরে, বিশেষ করে আসামে প্রচার লাভ করেছে। কাব্যগুণের দিক দিয়ে নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণ' উৎকৃষ্ট না হলেও সাধারণ লোকসমাজে প্রচারলাভে কোন ব্যাঘাত ঘটেনি।

মনসামঙ্গল কাব্যের উত্তরবঙ্গের ধারার অন্যতম কবি **জগজ্জীবন ঘোষাল**। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কবি জগজ্জীবন ঘোষাল **'মনসামঙ্গল'** কাব্য রচনা করেন। কবির জন্মস্থান দিনাজপুর জেলার কুচিয়ামোড় গ্রামে (বর্তমানে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার বারসোই অঞ্চল, যা উত্তরদিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের কাছাকাছি)। পিতামহের নাম জয়ানন্দ, পিতা রূপধায় চৌধুরী, মাতা রেবতী, সহোদর ঘনশ্যাম ও পত্নী পদ্মমুখী। জাতিতে ব্রাহ্মণ, ঘোষাল পদবীর কবিরা হলেন রাঢ়ী শ্রেণী। কবির কুচয়িামোড় গ্রাম মহারাজ প্রাণনাথের রাজ্যভুক্ত ছিল। তাঁর পুথিটি প্রথম সম্পাদনা হয় ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে জলপাইগুড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও কলকাতার ড. আশুতোষ দাসের যুগ্ম প্রচেষ্টায়। ড. আশুতোষ দাস নিজের একটি সম্পূর্ণ পুথি, শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টার্যের অসম্পূর্ণ পুথিটি এবং আরো একটি পুঁথি-এই তিনটি পুঁথির সাহায্য নিয়ে সম্পাদনা করেন জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলটি এবং আগ্রহী পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে দেন এই কাব্য।

জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলটি দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—

১. দেবখণ্ড
২. বানিয়াখণ্ড

দেবখণ্ডের মধ্যে পুরাণ অনুযায়ী সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা, মনসার জন্মপ্রসঙ্গ ও মনসা হরগৌরী উপাখ্যান। দ্বিতীয়টিতে আমাদের চিরপরিচিত ও পরম্পরাগত চাঁদসদাগর ও বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী।

দেবখণ্ডে অনাদি দেব নিরঞ্জনের পৃথিবীকে প্রলয় থেকে রক্ষা করার জন্য চার ভাইকে সৃষ্টিকার্যে আদেশ দেন। এই চার ভাই ধর্ম দেবতার সৃষ্টি করেন। ধর্ম আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি করেন। আবার ধর্মের মনঃকষ্টজনিত নিঃশ্বাস থেকে মনসার জন্ম হয় এবং এই ধর্মের সঙ্গেই মনসার বিবাহ হয়। পরে ধর্মের মৃত্যু হয় এবং মনসা চিতার শয্যায় পুড়ে জীবন ত্যাগ করে। সেই চিতা থেকে শিশু কন্যা পার্বতীর জন্ম হয়। হেমন্তঋষির কন্যারূপে বড় হওয়া এই পার্বতীর মালঞ্চ বনে সাক্ষাৎ হয় শিবের সঙ্গে। সুন্দরী-যুবতী কুমারী পার্বতীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয় শিব এবং গান্ধর্ব-বিবাহ হয় তাদের মধ্যে। পরে স্ত্রী গঙ্গার অনুমতি নিয়ে পার্বতীকে কৈলাসে নিয়ে আসেন। এখানে দেখা যায় শিব গঙ্গা-পার্বতীর দ্বন্দ্বে বিরক্ত হয়ে গৃহত্যাগে উদ্যত হন। পরে মালঞ্চবন মুকুলিত হয়েছে জেনে সেখানে গমন করেন। মালঞ্চী বনে সুবেশ বিদ্যাধরীদের দেখে পার্বতীকে স্মরণ করে মদনবিকল শিব স্খলিতকাম হয় এবং তা পদ্মপাত্রে রাখেন। মহাদেবের সেই অক্ষয় মহাবীর্য পাতালে প্রবেশ করে বিষহরির জন্ম হয়। বাসুকি নাড়ী ছেদ ও কর্ণভেদ করেন এবং 'জয়বিষহরি' নাম রেখে নিজের ভগ্নী মনে করে পালন করতে থাকেন। অন্যদিকে একবছর ধরে শিব মালঞ্চ বনেই থাকলে পার্বতী গোয়ালিনী ছদ্মবেশে শিবের কাছে যান এবং শিবের সঙ্গে মিলনের ফলে গণেশের জন্ম হয়। একইভাবে বারো বছর পর মালঞ্চবনে কুচুনীরূপে শিবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে কার্তিকের জন্ম হয়। বাড়িতে ফেরার সময় সরোবর তীরে মনসাকে দেখে শিব মদনবাণে পীড়িত হন। দেবী নিজের পরিচয় দিলে মহাদেব কন্যাকে নিজ মূর্তি ধারণ করতে বলেন। দেবী বিভিন্ন নামের সর্পে সজ্জিত হয়ে শিবাত্মজা হিসেবে প্রমাণ দেন। দেবখণ্ডে আমরা চিত্রটি সুন্দরভাবে পাই—

> ''বাপের চরণে পড়ে জয় ব্রাহ্মণী।
> জিয় জিয় বলিয়া শঙ্কর বোলে বাণী।।
> গোসাঞি বোলে পদ্মানলে জনম তুমার।
> পদমকুমারী নাম হইবে প্রচার।।''[৩৫]

নিষেধ করা সত্ত্বেও মনসা পিতার সঙ্গে বাড়িতে আসেন ফুলের সাজিতে ঢুকে। পরে গঙ্গা-পার্বতীর কবলে পড়লে পার্বতীর আক্রোশে মনসার কোমর ভাঙে, এক চোখ কানা হয়ে যায়। এরপরে আমরা শিবের সমুদ্রমন্থন, কালকূট বিষে শিবের প্রাণ হারানো, মনসার শক্তিবলে পুনরায় প্রাণ ফিরে পাওয়া ইত্যাদি ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে দেখা যায় জরৎকার মুনির সঙ্গে বিবাহের পরে সরোবর তীরে দু'জনে বিশ্রাম করে। বর্ষাকালে নদীর চরে চেঙ, ব্যাঙ, মংস্য দেখে লোভ বশত তা খেতে থাকেন। নিদ্রাভঙ্গের পরে মুনি এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হন এবং

স্ত্রীকে কলঙ্কিনী নারী ভেবে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়েন। সন্ধার সময় পদ্মা স্বামীকে ঘুম থেকে জাগালে মুনি ছলনা করে অসময়ে ঘুম ভাঙানোর অপরাধে পদ্মাকে ত্যাগ করে চলে যান। স্বামী পরিত্যক্তা মনসা একা অরণ্যে বসবাস করতে থাকেন। পরে পুত্র আস্তিকের অন্নকষ্টের কথা ভেবে নরলোকে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন।

নরলোকে দেবী ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে এসে রাখালদের কাছ থাকে পূজা পাওয়ার চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মণী ছদ্মবেশে রাখালদের কাছে দই চাইলে পরিণামে তারা দেবীকে অপমান করলে তাদের 'গোধন' লুকিয়ে রাখনে। রাখালরা ঘটা করে মনসা পূজা করলে 'গোধন' ফিরে পায় তারা রাখালদের পূজা পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী সরোবরে জালু-মালুর কাছে যান। মাছ চেয়ে মনসার নাম করে জাল ফেলতে বললে তার মধ্যে সোনার ঘট ওঠে আসে দেবীর আদেশে জালু-মালু সোনার ঘট বাড়ি নিয়ে গিয়ে নানা উপাচারে পূজ করে। এই দেবখণ্ডে দেখা যায় সৃষ্টি ধর্মরাজই জগৎস্রষ্টা। শূন্যপূরাণের অনুসরণে এখানে সৃষ্টি তত্ত্বের বর্ণনা রয়েছে।

জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে দেখি চাঁদ-সদাগর ও বেহুলা-লখীন্দর পর্বের নাম হল বাণিয়া খণ্ড। এখানে চাঁদ সদাগরের কাহিনী শুরু হয়েছে একটু অন্যভাবে, যা গতানুগতিক মনসামঙ্গল কাব্য থেকে আলাদা। এখানে দেখা যায় গৌঢ়নগরের মহারাজ ছিলেন বিক্রমকেশরী। তার নগরে সব মানুষই সুখী ও ধনী। এই বিক্রমকেশরীর অধীনে কোটীশ্বর নামে নৃপতি ছিলেন, স্ত্রী কলাবতী। অপুত্রক অবস্থায় এই কোটীশ্বর শিবের বরে পুত্র সন্তান লাভ করেন। আর এও জানতে পারেন এই পুত্র শিব ছাড়া অন্য কারোর পূজা করবে না। এই পুত্রই হল চন্দ্রপতি। এই চন্দ্রপতির সাথে সনক সাধুর কন্যা মনকার বিয়ে হয়। শিবের কৃপায় ছয়পুত্র লাভ করেন এবং পুত্রদের বিবাহও দেন।

মনসা মর্ত্যে পূজা প্রচার করতে চান এই চাঁদের সদাগরের মাধ্যমে। মনসা শিবকে অনুরোধ করেন যাতে শিব ভক্ত চাঁদ সদাগরকে আজ্ঞা করেন তাঁর পূজা করার জন্য। দেবাদিদেব মহাদেব পদ্মার পীড়াপীড়িতে দৃঢ় নিষ্ঠা সম্পন্ন চাঁদ সদাগর ধরকে মনসার পূজার করতে ও পৃথিবীতে তার পূজা প্রচার করতে বলেন। এর উত্তরে চাঁদসগাদর বলেন—

''ক্রোধ হইয়া বোলে চান্দো শুন শূলপাণি।
এক মহাদেব বিনে অন্য নাহি জানি।।
গঙ্গাজল থাকিতে কেনে অন্য জল খাই।
বটবৃক্ষ ছাড়িব কেনে সহড়াতলে যাই।।
লাজ নাই পদ্মার এ মত বোলে বাণী।

শিবের ভক্তের হাতে চাহে ফুলপানি।।”[৩৬]

অনাচারের কারণে যাকে স্বামী ছেড়ে চলে গেছে তাকে কিছুতেই পূজা দিবে না চাঁদ। উক্ত বক্তব্য শুনে লজ্জিত-দুঃখিত মনসা ক্রোধে বানিয়াকে ‘দুর্জ্জন’, ‘বর্ব্বর’ বলে তিরস্কার করে ধনে পুত্রে তাকে নাশ করার কথা বলেন। ফুলপানি না পেয়ে নেতার সঙ্গে যুক্তি করেন পৃথিবীতে কিভাবে পূজা প্রচার হবে। চাঁদ সদাগর মনসার ভাই, তাই চাঁদের কাছে গিয়ে সরাসরি পূজা প্রচারের কথা বলতে বলেন নেতা। কারণ নেতার মতে ‘পিরীতে পাইলে পূজা বিবাদের কিবা কাজ।’ মনসা দাদা সম্বোধন করলে প্রত্যুত্তরে চাঁদ ‘ভাতারছাড়ি’ বলে গালিগালাজ করেন এবং ‘হেমতালের লাঠি’র ভয় দেখান। পরিণামে চাঁদের ছয় পুত্রকে সাপে দংশন করে। বিষহরিকে না পূজা করে পুত্রদের হারিয়ে চাঁদ সদাগর পরিতাপ করতে থাকেন। আবার এখানে দেখা যায় তাড়কা রাক্ষসীকে দিয়ে চাঁদের ছয়পুত্রের মৃতদেহ হরণ করেন মনসা।

পুত্রদের হারিয়ে চাঁদ সদাগর পাটনে যাওয়ার সংকল্প করেন। বিভিন্ন ধরনের গাছ কেটে চৌদ্দ ডিঙ্গা প্রস্তুত করান। কাঁচা হরিদ্রা, পুরাণ সুকুতা, মাসকালাই আটার সুট, জিরা, মরিচ, লবঙ্গ, ফুলবড়ি, কদলীর খার, করুয়া সানকি, নারিকেল, তাল, বেল, কাঁঠাল ও আম প্রভৃতি নিয়ে বাণিজ্যে যায়। বলাবাহুল্য এখানে পাটের ধক্‌ড়া মেখলা ও শাড়ির কথা পাওয়া যায়। যা আসাম সংলগ্ন উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত। চাঁদের বাণিজ্যে যাওয়াকালীন উত্তরবঙ্গের নদ-নদীর কথা পাই আমরা। যেমন— ব্রহ্মপুত্র, করতোয়া, আত্রাই, ধবলা, পাঙ্গা প্রভৃতি। বাণিজ্য থেকে ফেরার সময় মনসার চক্রান্তে নানা বিপদের মধ্যে পড়ে। নৌকা ডুবে গেলে চাঁদ সদাগরসহ বাঙ্গাল মাঝিরা বিলাপ করতে থাকে। কেউ যুবতী স্ত্রীর জন্য, কেউ বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য কেউ নিজের ঘরবাড়ি-স্বদেশের কথা ভেবে কান্নায় ভেঙে পড়ে। শেষে মনসার কথায় হনুমান চৌদ্দ ডিঙা ডুবিয়ে দেয়।

চৌদ্দ ডিঙা ডুবে যাওয়ার পর চাঁদের চরম দুর্গতি শুরু হয়। সর্বস্ব হারিয়ে চাঁদ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণীর (মনসা) কথা মতো রান্নার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু রান্নার উপরে মনসা কাকরূপে বর্জ্য ত্যাগ করলে শিব শিব বলে চাঁদ পথে নেমে পড়েন। শ্রীগোলানগরে চার পণ কড়ির বিনিময়ে হাঁড়ির ভার বয়ে নিয়ে চললে সেখানে বাঘ্ররূপে মনসা হুঙ্কার ছাড়ে এবং পড়ে গিয়ে সব হাঁড়ি ভেঙে যায়। কুম্ভকারের কোপে কড়ি ও ধূতি হারিয়ে দিগম্বের চাঁদ শ্রীগোলার হাটে গাছের ছাল পড়ে চলতে থাকেন। সেখানে কোতায়ালের হাতে মার খান। নানা দুর্গতি ও বিপদের মধ্য দিয়ে চাঁদ শেষে নিজের বাড়িতে এসে লুকিয়ে থাকলে সেখানেও চোর ভেবে মার খায়। তবে নানা বিপত্তির মধ্যে পড়েও চাঁদ মনসার সঙ্গে আপোষ করতে নারাজ। তাই তার মুখে শোনা যায়—

''মাথে হাত দিয়া কান্দে চান্দো অধিকারী।
বিবাদ সাধিলে পদ্মা ঢেমনাভারতী।।''[৩৭]

পরে সনকা স্বামীকে চিনতে পারে। অবশেষে চাঁদ নিজ বাড়িতে পৌঁছান চরম দুর্ভোগের পর।

নিজ প্রাসাদে চাঁদ ফিরে এসেছেন কিন্তু মনসাদেবীর উপরে বিমুখ। মনসা নেতার সঙ্গে যুক্তি করে মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য স্বর্গের ঊষা-অনিরুদ্ধকে নিয়ে আসার সংকল্প করেন। একদিকে মনসা-ধন্বন্তরি ছন্মবেশে সনকাকে পুত্রবর দেন এবং বিবাহ রাত্রে পুত্রকে সাবধানে রাখতে বলেন। অন্যদিকে দেব সভায় গিয়ে ইন্দ্রকে দিয়ে নৃত্যরত ঊষা-অনিরুদ্ধকে অভিশাপ করান পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার। সনকার গর্ভে অনিরুদ্ধ লখীন্দর রূপে এবং মেনকার গর্ভে ঊষা 'বিহুলা' রূপে জন্ম গ্রহণ করে। লখীন্দর ষোড়শ বৎসরের হলেও বিবাহের কোন আয়োজন না দেখে মনসা ব্রাহ্মণ কন্যার ছদ্মবেশে লখীন্দরকে বিবাহোন্মুখ করে তোলেন। আবার কামসোনাকে দিয়ে মামী কৌশল্যা রূপে স্বপ্নাদর্শন করিয়ে কামাসক্ত করে তোলেন। পরের দিন সকালে সরোবর তীরে মামী কৌশল্যাকে জোরপূর্বক আলিঙ্গন করে মিলক্রিয়া সম্পন্ন করে। সনকার মুখে সংবাদ পেয়ে লজ্জিত চাঁদ সদাগর পুত্রের বিবাহের আয়োজন করেন। অনেক খোঁজ করেও মেয়ের সন্ধান না পেয়ে, শেষে ব্রাহ্মণীর অভিশাপকে তোয়াক্কা না করে স্বামী মারা গেলে ছয়মাসে জীবিত করবে, বেহুলার মুখে এই উক্তি শুনে চাঁদ বেহুলার পিতা 'বাছো সদাগরে'র সাথে দেখা করে বিবাহ স্থির করেন। যথারীতি মেনে বিয়ের দিন স্থির হয় এবং মনসার নানা চক্রান্তের পরেও শুভকাজ সুসম্পন্ন হয়ে গেলে বেহুলা-লখীন্দর বাড়ি ফিরে আসে। এখানে অন্য মনসামঙ্গল কাব্যের মতোই লখীন্দরকে কালসাপ দংশন করে। বেহুলা নানা বিপত্তির মধ্য দিয়ে নানা ঘাট পেরিয়ে দেবপুরে পৌঁছে নৃত্যাদির মাধ্যমে শিবকে সন্তুষ্ট করে শেষে মনসার কাছ থেকে সমস্ত ধনসম্পদ, ডিঙ্গা, ছয় ভাসুর ও স্বামী লখীন্দরকে ফিরে পেয়ে চম্পক নগরে যাত্রা করে।

চম্পকনগরে পুত্রশোকাতুরা সনকা মনসার মায়ায় পুত্র ফিরে আসার স্বপ্ন দেখে। এরকম পরিস্থিতিতে বেহুলা ডোমনির বেশে চাঁদের পুরীতে প্রবেশ করে সকালে খোঁজ নেয়। পরে বেহুলা-লখীন্দরের আসল পরিচয় পেয়ে সনকাসহ সবাই গগড়িয়ার ঘাটে যায় তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য। সমস্ত কিছু ফিরে পেয়েও চাঁদ সদাগর মনসার পূজা দিতে অসম্মত হয়ন। বেহুলা-চাঁদের মধ্যে বাক্-বিতণ্ডা চলে। মনসার পূজার কথা বলে। 'চাঁদ মনসারে পুজিব' কিনা পুজিব দ্বন্দ্বে এবং দোলাচলতায় শেষে বাম হাতে পূজা দেন। এই পরিস্থিতির চিত্র খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে—

''ডাহিন হস্ত করি আপনে চান্দো বাম হস্ত করি।

সেই বাম হস্তে চান্দো পূজে বিষহরি।।
নানা পুষ্প লঞা চান্দো দিল বাম হস্তে।
হাতে হাতে পদ্মাবতী বান্দিলেন মাথে।।"[৩৮]

চাঁদের বাম হস্তের পূজাতেই মনসার সঙ্গে দীর্ঘ বিবাদের অবসান হয়। মনসা খুশি হয়ে চাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বণিককুলে সর্প ভয় কোনোদিন থাকবে না বলে জানান। শেষে বেহুলা-লখীন্দর ইন্দ্রের আদেশে মনসার রথে চড়ে স্বর্গে গমন করে বাড়ির সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে।

উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যধারার তন্দ্রাবিভূতি, জীবন মৈত্র, দুর্গাবর, সনকার প্রমুখ কবিদের কাব্য পেলেও জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে উত্তরবঙ্গের জনজীবনে। গতানুগতিক ধারা অনুযায়ী কাব্য রচনা হলেও স্থানের বিভেদে, সময়ের ব্যবধানে নতূনত্ব দেখা যায় অনেকক্ষেত্রে। চৈতন্য পরবর্তী এই কবির কাব্যে মনসাকে দেখা যায় প্রীতির মাধ্যমে পূজা চান, বিবাদের মধ্য দিয়ে নয়, আবার অনেক সময় রুঢ়, কঠোর রূপ ধারণ করেছে। চাঁদ চরিত্রের ক্ষেত্রেও তাই। যে চাঁদ শেষ পর্যন্ত বাম হাতে পূজা দিয়েছে মনসাকে। সেই নাকি, মনসার পূজা করেননি তাই ছয় পুত্র হারিয়েছে বলে মনস্তাপ করেছেন, চৌদ্দ ডিঙা ডুবে গেলে কেঁদে আকুল হয়েছেন বাঙ্গালদের সঙ্গে। আসলে সপ্তদশ শতকের দিক থেকে মানুষের কথা উঠে এসেছে সাহিত্যে। তাই মানসিক দ্বন্দ্ব, জটিলতা, দোলাচলতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় মনসা ও চাঁদসদাগরের মতো প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে। কাব্যে চরিত্রগুলির নামের ক্ষেত্রেও নতূনত্ব দোখা যায়। যেমন— চাঁদের ভৃত্য নেড়ার নাম লেঙ্ঘা।

বেহুলা — বিহুলা
বেহুলার মা— মেনকা
বেহুলার পিতা— বাছা সদাগর ইত্যাদি।

এই কাব্যে আরো নতুন সংযোজন হল লখীন্দরের সাথে মামী কৌশল্যার পর্বটি। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে জগজ্জীবন ঘোষাল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

''মাতুলানীর সঙ্গে লখিন্দরের কুব্যবহারের বর্ণনা করিয়া জগজ্জীবন তাঁহার রচনাকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু কে বলিবে ইহার ভিতর দিয়াই হয়ত কবি তাঁহার পারিপার্শ্বিক সমাজের রস ও রুচির পরিচয় দিয়াছেন।"[৩৯]

একইভাবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদ-নদী— করতোয়া, পাঙ্গা প্রভৃতি বিভিন্ন রকম গাছ— পিয়লা, পিপলি, খেজুর, শাল, সিমলি, চাপা নাগেশ্বর, বকুল, কাঠাল, নিম, নারিকেল, জলপাই প্রভৃতির

পরিচয় পাই। উত্তরবঙ্গের সবুজ প্রকৃতির আভাস পাই আমরা এর মধ্য দিয়ে। এছাড়া আঞ্চলিক শব্দ-থুকুড়া, পালান, সাপুড়া, মুটফি, খাদ গাবর, পাতল, ডাবর, মুঞি প্রভৃতি আরো অনেক উদাহরণ পাই কবির মনসামঙ্গলে। বাঙালীর আমিষ-নিরামিষ খাবারের সঙ্গে (চেঙ্গ-মৎস, চিতলের কোল, সউল, খাশি মাংস, চচুড়া মৎস, বড়ি ভাজা, কদলীর মাজা) শাক সব্জিরও বর্ণনা পাই। আবার উত্তরবঙ্গের অনেক লোকাচারের চিত্র পাই। যেমন— লখীন্দরের বিবাহ বাসরের লোকাচারগুলি উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনজাতি বা অন্যান্য সম্প্রদায়ে প্রচলিত। এই সূত্রে বলা যায় লখীন্দরের বিয়েতে তুলসীপাতা হস্তান্তর রীতি, মেনকার জামাতা বরণ, কন্যা-জামাতাকে বাসর ঘরে নিয়ে যাওয়ার লোকাচার, কন্যা বিদায়ের করুণ চিত্র বর্ণনায় উত্তরবঙ্গের রীতিনীতির প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে। তাই বলা যায় জগজ্জীবন ঘোষাল মনসামঙ্গলের কাব্যে মনসাদেবীর পরিচয় দিতে গিয়ে লৌকিক জনজীবনের চিত্র যেমন জীবন্ত ও বাস্তব সম্মত ভাবে বাঙালী পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন, তেমনি মনসা ও চাঁদ সদাগরের কাহিনীগুলিকেও বাঙালীর আত্মার সঙ্গে মিশিয়েছেন। যার ফলে মনসামঙ্গল ধারার এক স্বতন্ত্র কবি হিসেবে তিনি আজও বিশেষ স্থানের অধিকারী, তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় মনসামঙ্গল কাব্যের— ১. পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ, ২. পশ্চিমবঙ্গের বা রাঢ়ের মনসামঙ্গল, এবং ৩. উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল। এই তিন ধারার কবিদের মধ্যে পঞ্চদশ শতকের কবি বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়', বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ', নারায়ণদেবের 'পদ্মপুরাণ' ও সপ্তদশ শতকের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে মনসার যে কাহিনী আলোচিত হল। অল্প কিছু পার্থক্য থাকলেও চৈতন্য পূর্ববর্তী পঞ্চদশ শতকের মনসামঙ্গলের যে তিন কবির কাব্য কাহিনী ধারা অনেকটা একরকম। তবে সপ্তদশ শতকের উত্তরবঙ্গের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে অনেকটা পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমেই তার কাব্যের বন্দনাংশে চারটি পংক্তিতে দেবী অম্বুজা ছাড়া অন্য কোন দেবদেবীর বন্দনা গান করেননি। সমগ্র সৃষ্টিপত্তন প্রসঙ্গ বর্ণনায় যে কাহিনী জগজ্জীবন ঘোষাল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেভাবে সাজিয়েছেন তা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গীয় কবিদের বর্ণিত আখ্যান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিপ্রদাস পিপলাই, বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণদেবের কাব্যে মনসা যেমন দেবী ডোমনী বেশে, পাটনী বেশে শিবকে ছলনা করেন, জগজ্জীবনের কাব্যে কিন্তু শিবই কয়ালী রূপে দেবীকে ছলনা করেন। মনসার জন্মবৃত্তান্তে স্বর্গের বিদ্যাধরীদের মনোহর রূপ দর্শনে শিবের মনে কামরসের সৃষ্টি হয়, সেই সঙ্গে পার্বতী মালঞ্চ বনে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলে শিবের বক্তব্যে সমাজের রক্ষণশীলতার পরিচয় ও ইত্যাদি নতুন দিক পায় আমরা। নেতা

চরিত্রের পরিচয় আমরা 'বানিয়া খণ্ডে' প্রথম পাই, যা অন্যান্য কবিদের থেকে আলাদা। আবার লখীন্দরের মাতুলানীর প্রতি আসক্তি, এই রোমাঞ্চকর বর্ণনায় সপ্তদশ শতকের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে অভিনব সংযোজন। সেই সঙ্গে মনসাদেবী ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে বেহুলার স্বর্গে যাওয়ার উপায় বলে দেওয়া, শুধু তাঁর কাব্যেই পাওয়া যায়। এছাড়া বলা যায়, লখীন্দরের প্রাণ ফিরে পাওয়ার পর মনসাদেবীকে পূজা প্রদানের পন্থার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও মনসা দেবীর সঙ্গে চাঁদের দ্বন্দ্ব, মনসাদেবীর পূজা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও চাঁদ সদাগরের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব-প্রায় সব কবির কাব্যেই একই রকমভাবে পেয়ে থাকি।

তথ্যসূত্র:

১. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা:লি:, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, নতুন সংস্করণ ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ-২০১২-২০১৩, পৃ. ৩৮।

২. কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, শ্রী জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ ২০০৯, পৃ. ৫

৩. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), দীনেশচন্দ্র সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আর্য ম্যানসন (নবম তল) ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩, পর্ষৎ কর্তৃক তৃতীয় মুদ্রণ: আগস্ট ২০০২/বি, পৃ. ১৯২

৪. VIPRADASA'S MANASA-VIJAYA, Sukumar Sen, The Asiatic Society, 1park Street, Calcutta, P-3.

৫. সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ১৯৪০, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৮, পৃ. ১৭৭

৬. VIPRADASA'S MANASA-VIJAYA, Sukumar Sen, The Asiatic Society, 1 park Street, Calcutta, P-3.

৭. তদেব, পৃ. ১৭

৮. তদেব, পৃ. ৬৫

৯. তদেব, পৃ. ১৪৬

১০. তদেব, পৃ. ১৬৯

১১. তদেব, পৃ. ২২৯

১২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা:লি:, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ-১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ-২০১২-২০১৩, পৃ. ৭২

১৩. VIPRADASA'S MANASA-VIJAYA, Sukumar Sen, The Asiatic Society, 1 park Street, Calcutta, পৃ. ৪৪

১৪. কবি বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'-শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ ২০০৯, পৃ. ৮

১৫. কবি বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'-শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ-২০০৯, পৃ. ২৩

১৬. তদেব,পৃ. ৪৮-৪৯

১৭. তদেব, পৃ. ৯১-৯২

১৮. তদেব, পৃ. ১০৮-১০৯

১৯. তদেব, পৃ. ১১৩

২০. তদেব, পৃ. ১৪৮-১৪৯

২১. তদেব, পৃ. ১৯৪

২২. তদেব, পৃ. ২৫১

২৩. তদেব, পৃ. ২৯০

২৪. তদেব, পৃ. ৩১৩

২৫. তদেব, পৃ. ৩৪৬

২৬. তদেব, পৃ. ৩৪৮

২৭. তদেব, পৃ. ৪৩০

২৮. তদেব, পৃ. ৪৬৪

২৯. তদেব, পৃ. ৪৮৫

৩০. তদেব, পৃ. ৫৩৫

৩১. 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' দীনেশচন্দ্র সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আর্য ম্যানসন (নবম তল) ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩, তৃতীয়

মুদ্রণ-আগস্ট ২০০২, পৃ. ১৯৭

৩২. শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত: 'সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, প্রথম মুদ্রণ-১৯৪২, পুনর্মুদ্রণ-২০১১, পৃ. ২১।

৩৩. তদেব, পৃ. ৩০

৩৪. ড. ভূদেব চৌধুরী : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, ভাদ্র-১৩৯১, পুনর্মুদ্রণ: জুলাই ২০০৫, আষাঢ় ১৪১২, পৃ. ১৮৮

৩৫. কবি জগজ্জীবন বিরচিত 'মনসামঙ্গল' শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ দাস কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ. ৭৮

৩৬. কবি জগজ্জীবন বিরচিত 'মনসামঙ্গল', পৃ. ১১৪

৩৭. তদেব, পৃ.১৪৮

৩৮. তদেব, পৃ. ৩৫৬

৩৯. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, প্রা:লি:, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট (কলেজ স্কেয়ার), কলিকাতা-৭৩, পরিবর্ধিত একাদশ সংস্করণ, বইমেলা জানুয়ারী, ২০০৬, পৃ. ৩০৯

*****